1973

CA-41

093.7
P.926

ID=589N12_CA-41

41

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

কর্মসচিব
স্বপন চক্রবর্তী

সম্পাদক
রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত

পৌষ ১৩৭০

ডিসেম্বর ১৯৭৩

093.7
P.926

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র

সত্যজিত রায়

সূচী

না পড়লেও চলবে ॥	৫	॥ রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় ॥
নির্বাহ ॥	৭	॥ হারুণ তাজিয়েফ ; অনুবাদ : বিষ্ণু দে ॥
খরা—১৯৭২ ॥	১০	॥ দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ॥
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা : দুটি সূত্র ॥	১২	॥ স্বপন চক্রবর্তী ॥
শরৎচন্দ্র : ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ॥	১৮	॥ তপোব্রত ঘোষ ॥
হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ॥	২৩	॥ কমলকুমার ঘটক ॥
প্রাজ্ঞতা ॥	২৯	॥ বার্ণিক রায় ॥
৪ঠা মার্চ, ১৯৬৯ ॥	৩০	॥ জিষ্ণু দে ॥

CONTENTS

Yours Affectionately	1	K. Zachariah.
Rabindranath	10	Amal Bhattacharji.
The Statistics of Death	13	Atindra Mohon Goon.
A Criticism of the Age	21	Supriya Das Gupta.
The Role of Death in *Antony & Cleopatra*	25	Shirshendu Chakrabarti.
Science : illusion and reality	31	Sumit Ranjan Das.
Civilisation—its Origins and Constituents	41	Sipra Ganguly.
The Report of the Publication Secretary	47	Swapan Chakravorty.
Notes on Yours Affectionately, K. Zachariah	50	Nilmoni Mukherjee/Hiren Chakrabarti.
Prof. S. N. Bose : A Personal Tribute	55	Jishnu Dey.

Published by the Principal, Presidency College, Calcutta 700012 and Printed by P. C. Ray
at Sri Gouranga Press P. Ltd., 5 Chintamani Das Lane, Calcutta 700009.

না পড়লেও চলবে

"Words whose utter inanity proved his insanity"
Lewis Carrol; *The Hunting of the Snark.*

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা পত্রিকা আছে; সেটাকে নিয়মিত প্রকাশ করার একটা দুশ্চেষ্টা চলেছে। গত বছরের সংখ্যা হয়ত আপনাদের অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। শুভার্থীদের সব আশা ধূলিসাৎ করে এই যে আবার একটা সংখ্যা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেল সেটা ঐ দুশ্চেষ্টারই পরিণাম। আশ্বাস দিচ্ছি, কাগজের মান এখনো বেশ ভালো—উনোন আগের মতই ধরানো যাবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার উন্নাসিকতা নিয়ে বাজারে অনেক দিনের দুর্নাম আছে। আমরা দেখে খুশি হয়েছি যে আমাদের এক বন্ধু কলেজের পত্রিকাও আমাদের এই উন্নাসিকতার প্রতি নজর দিয়েছেন। আমরা আশা করছি যে গত বছরের মত, এই বারের পত্রিকাও উন্নাসিকতার দুর্নাম বজায় রাখতে পারবে। কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রীও এই উন্নাসিকতার প্রতি গতবার নাক সিটকিয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্য একটা ছোট কথা ভুলে গিয়েছিলেন : কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে কলেজ পত্রিকা গড়ে তুলতে চান, কলেজ পত্রিকা ঠিক সেই ভাবেই গড়ে ওঠে। মনে রাখবেন সম্পাদক লেখা নির্বাচন করেন মাত্র, লেখার ভার কিন্তু আপনাদের ওপর। অতএব যখন দেখা যায় যে এই রসরঙ্গপিপাসু ছাত্রবৃন্দ রসসৃষ্টি করতে নারাজ তখন যে কটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাই দিয়েই পত্রিকার পাতা ভরাতে হয়। ভালো গল্প বা হাল্কা প্রবন্ধ ছাপাবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব, আপনারা লিখুন তাহলেই আমরা ছাপাবো।

যাঁরা নাক সিটকিয়েছিলেন তাঁরা এক দিক থেকে ভালো। কারণ তাঁরা পত্রিকা সম্বন্ধে সচেতন। আরো এক দলকে কলেজে দেখা যাচ্ছে যাঁরা পত্রিকা বেরুলো কি না বেরুলো, ভালো হল কি খারাপ হল তা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ এই পাশবালিশের দল ভগবদ্‌গীতার আদর্শ মানুষ হতে পারেন, আজকের দিনে বিপদ ঘটান। এঁদের যত তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে অগস্ত্য যাত্রা হয় ততই মঙ্গল।

পত্রিকাটি একবার উল্টে দেখবেন—এই অনুরোধ সকলকে করবো। এই শক্ত কাজটা যদি একবার করে ফেলেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে অর্থনীতি, বাংলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের ছাত্ররা আগের থেকে অনেক বেশী পড়াশুনো করছেন, আজকাল তারা বেশী করে কম লিখছেন। স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এবারও লেখা কম এসেছে। ধন্যবাদ।

রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

নির্বাহ

হারুণ তাজিয়েফ
অনুবাদ/বিষ্ণু দে

সেই দিনই, আমরা, বাইকে চেপে চলেছি, লিএজ্ থেকে সের‍্যাঁয়, ম্যাকাডামে, ডান দিক ঘেঁষে। অর্নেস্ট্ আর জাঁ-পিএর গাইড হিসাবে, আর প্রায় পঞ্চাশ মিটার পিছনে পিছনে আর্সেন্ আর আমি, দুটো জি, পি, নয় নম্বর পকেটে। আমরা সের‍্যাঁয় যাচ্ছিলুম এক বেইমানের ওপর চড়াও করতে, সে আমাদের চারজন কমরেড্কে বেচে দিয়েছে। কিন্তু সে আরেকটা ইতিহাস। এখন তোমাকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আরসেন্ কি রকমে কমিশের্ জোবাকে ঘায়েল করেছিল। পেড্ল করতে করতে সে-ই আমাকে বলেছিল।

আর্সেন্ ছেলেটা শান্ত প্রকৃতির, সহজে রক্ত গরম করে না। তার মাথাটা সুন্দর বল্ব না জোরালো বল্ব, জানি না। বেঁটেই বলা চলে, ঘন লম্বা বাদামী চুল। আমার বেশ মনে আছে তার ধূসর চোখের দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি এক গোছা হাল্কা ভুরুর তলায়। চোয়াল উঁচু আর তখন (সে দুঃসময়ে প্রায়ই চেহারা বদলাতে হত তো) খুব হাল্কা সরু গোঁফ ছিল তার।

সে জনগণেরই সন্তান ছিল কিন্তু বেআইনী যুগের আগে তার কি পেশা ছিল তা ঠিক আমার জানা নেই। সে আমাদের "স্পেশ্যাল্ ব্রিগেড্"-এ ছিল! গুটি বারো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলে ছিল আমাদের দলে। তাদের ওপর একান্ত প্রয়োজনভার ছিল বিশ্বাসঘাতক, খয়ের খাঁ, গেস্টাপিস্ট বা যেসব বেল্জীয়ান্ শত্রুপক্ষে চলে গেছে, তাদের শেষ শাস্তি দেওয়া। চুয়াল্লিশের মে মাসে একটা বিশ্বাস-ঘাতকতায় তারা সবাই ধরা পড়ে, লিএজে তাদের বিচার হবার কথা এবং কেল্লায় গুলিতে শেষ করা হবে ঠিক ছিল, আরসেন্ ও বাকি সবাই।

সেদিনই তো এইভাবে সের‍্যাঁর দিকে চললুম। আমাদের আলাপ হচ্ছিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম ও ৭·৬৫ এম্. এম্.-এর চেয়ে ৯ এম্. এম্. বেশি পছন্দ করে কি না।

—"ওঃ, ওসব প্রায় একই জানো। অবশ্য নয় নম্বরে একটু সুবিধা আছে। তবে আমার পক্ষে ও একই ব্যাপার। আজকাল যেসব অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে, তার মুস্কিল হল যে ঠিক চলবে কিনা বোঝা যায় না। যদি কিছু বিলেতী মাল প্যারাশুট্ করা যেত,

---

হারুণ তাজিয়েফ্ কুর্দিশ যুবক। বেলজিয়াম্-ফ্রান্সে নাৎসী বিরোধী প্রতিরোধে বীরত্ব প্রমাণ করেন। তাঁর এই ফরাসী গল্পটির জন্য অনুবাদক শ্রীযুক্ত পার্-র নিকট কৃতজ্ঞ।

তাহলে হত ভালো। গত বছরে যে কোল্ট ৯টা পেয়েছিলুম, সেইরকম। সেটা একেবারে খাঁটি জিনিস ছিল। কি বিশ্রীই লাগে যদি সব হারিয়ে যায়, তোমার মনে থাকতে পারে সেবারের লোক-সানটা, জার্মানরা যখন উবেরের গ্রেপ্তারের পরে ডিপার সন্ধান পেয়ে গেল। সেখানে আমাদের ছোটো যে বিলেতী মেশিনগান ছিল, সেগুলোও নামকরা জিনিস, কিন্তু আজকাল কি জিনিসই পাই আমরা।"

আমি বল্লুম—"তা বটে। ঐ বিলেতী চিজ্ সব পাওয়া যায় শুধু উত্তরাধিকারে। জানি না কিভাবে রবেরের মারফৎ পাওয়া যেত। তার এক সংগঠনের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, যারা লণ্ডনের সাহায্য পেত। হ্যাঁ, রবেরের কৃপায় আমরা বিলেতী অস্ত্র, বিলেতী বোমা পট্‌কা পেতুম। বল্‌ছ ভালো কিনা? সে সব ভারি সৌখীন বস্তু। গাদবার দরকার নেই, চর্বির মতো নমনীয় আর এমনি জোর—ঐটুকু তোমায় বলতে পারি। আর তেলও পাওয়া যেত, যেটা র‍্যামারের জন্যে লাগে। এর্নেস্ট একবার তিনদিনের এক অভিযানে গেল তার খোঁজে ফ্ল্যান্ডার্সে মুস্ক্রোঁ অঞ্চলে কোথায়। ব্যাপারটা বুঝছ তো? সারা বেলজিয়ম পার হয়ে ব্রুসেলের মধ্যে দিয়ে, ঘাড়ে দুটো বিরাট থলে, নমনীয় বস্তুতে, পাইপে আর গুলি বারুদে ভর্তি? রসিকতা নয়। কিন্তু ওদের ওসব আমাদের দেবার ইচ্ছা হয় না। আমি তো ভাবি কেমন করে এসব লোকই ঐ সব জিনিস পায়। তবু যদি ওরা এসবের আরেকটু সদ্ব্যবহার করত, তো ভাগাভাগি না করার জন্যে না হয় ক্ষমা করা যেত।"

"ঐ—"আর্‌সেন্ বল্লে—"ঐ তো হচ্ছে ক্যাপি-টালিস্টদের রীতি। আমার সন্দেহই হয় ঐ সব যন্ত্রধারীদের বিষয়ে, যারা আর্দেনে গান করে' বেড়ায় মেশিনগান আর পাইপ (রিভলভার) হাতে। ওরা সব যায় গাঁয়ের পথে ওড়াতে ওদের মে...কিন্তু তাছাড়া..."

নীরবতার মধ্যে আমরা চললুম চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আর্‌সেন্ আবার তার চিন্তায় ফিরে এল।

—"এইসব অস্ত্রশস্ত্র, যা জাতীয় (ফাব্রিক নাশিওনাল) কারখানা থেকে পাই অতি নিরেশ মাল। নড়বড়ে বুড়োর হাতের কাজ নিশ্চয়ই, মাথা খেয়ে রাখে। কিন্তু তবু কি জোর, যখন ব্যবহারে লাগে আমাদেরই হাতে।"

"শোন, মাসখানেক আগের ব্যাপার। আমাকে পাড়তে হল ঐ বোবা কোটালকে। জানিস্ তো, এই রেক্সিস্ট হতভাগাটা অনেক লোক ধরে রেখেছিল। খুব সহজ ছিল না, কারণ উল্লুকটা আমায় সন্দেহ করত, শালা! সর্বদাই এক চাকা গাড়ীতে ঘুরত আর সময়ের কিছু ঠিক থাকত না। যে সময়টা খরচ হল শুধু বেটাকে চোখে চোখে রাখতে, হালচাল একটু আঁচ করবার জন্যে। আমাদের ছুটোছুটিও করিয়েছে; সে দেমাক বেটা করতে পারে।

"যে রাস্তায় ও থাক্‌ত, প্রত্যেক কোণে কোণে কালোকুর্তি পাহারা বসানো—আফিস ঘাঁটি অবধি। দাঁড়াবার জো ছিল না বেশিক্ষণ ওর অপেক্ষায়, তাহলেই কালোকুর্তিরা রশুন ছাড়ত। তবু যদি খুব চালাক হত—শয়তান শালারা।

"যা হোক্ ওর বাড়ী থেকে বাইরে আনাগোনার ছক্ সব জানা গেল, সব চালাকি সত্ত্বেও—ঐ রাস্তাতেই এক বুড়োর বাড়ী থেকে। কিন্তু জানলা দিয়ে তাকানোটা খুব সোজা ছিল না, কারণ বুড়োর বাড়ীটা জোবার বাড়ী থেকে একশো মিটার টাক্, জানলা খোলাটা নিরাপদ ছিল না ঐ কালোকুর্তির জন্যে। তেরছাভাবে দেখতে হত, আর্শির ভেতর দিয়ে। আর ও বেরোলেই—টেলিফোন আসত। আমি ওর ঘাঁটি থেকে বেশি দূরে থাকতুম না। বাইরে লাফ দিয়ে ছুটতুম কমিশরিয়েটের দিকে। জোবা সেখানে যদি যায়, তো আমার কপাল খোলে। সাত সাতবার আমি সেখানে গিয়ে দেখি লবডঙ্কা: ও আর কোথায় গেছে। চারবার গুলি করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বেটা যা লাফিয়ে গাড়ী থেকে নামত আর যা ঝাঁপিয়ে পড়া আফিসের ভেতর। আরেক-বার, গুলির পক্ষে আমি বড়ো দূরে ছিলুম। আবার আরেকবার হল কি, সামনে দিয়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ী গেল পথটা আটকে। শেষটা তো তুমি জানো! ইস্, দিনের পর দিন কি রকম নষ্ট করেছি...তেরো-বার সেখানে গেছি, জানি না এ যে মনটা কতো

বিষিয়ে দেয় তা তুমি বোঝো কিনা। তারপরে, সেদিন সকালে, কমরেড্‌টি আবার টেলিফোন করলে। তোবা, তোবা, আমি ভাবলুম, যাই আরেক-বার হাওয়া খেয়ে আসি।

"বাইকে বেরোলুম সেই পথে। শেষটায় আমি হিসেব করতে পারতুম কতক্ষণ ওর গাড়ীতে লাগবে ওর বাসা থেকে আপিসে আসতে। তখন আমি নিজের গতি ঠিক করতে শিখে গেছি। আমি তখন স্পেশ্যালিস্ট হয়ে উঠেছি।

"দেখলুম গাড়ীটা থামল, আমার থেকে এই পঁচিশ মিটার টাক্‌ তফাৎ। অভ্যাস মতো তাড়াতাড়ি নামল। আমি বাইক থেকে তাগ্‌ করলুম আমার ন নম্বর ফব্রিক নাশিওনাল। দুত্তোর! প্রথম কার্তুজের পরেই খট্‌! মুণ্ডপাত! থাক, কপাল-জোরে সরে পড়লুম খুব। বোধ হয় আমার পিছু পিছু গুলি করল, ঠিক মনে নেই; এতো জোরে পা চালালুম যে আর ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা ছিল না। গাড়ীটা ঘুরিয়ে নেবার আগেই আমি দুটো মোড় ঘুরে সটান বাড়ীতে হাজির।

"আমার আক্ষেপটা, উঃ তুমি বুঝবে না! আমি ভাবলুম ঐ লোকটা আর তো ওর বাড়ী থেকে ঐ পথে আসবে না, আরো অনেক হুঁসিয়ার থাকবে! আর এতোদিন এতো নজর দিয়ে শেষটা গুলি ফেঁসে গেল।...আর সব কিনা একটা রদ্দি পট্‌কার জন্যে, যেটায় দুটো গুলিও চলে না!

"বাড়ীতে তো পেঁছলুম। আমার পিছনে কেউ ছিল না। বেটারা সময়ই পায় নি। আমার ঘরে উঠলুম, দুশমন পাইপটায় কি আটকেছে দেখতে।

"আরে দাদা বন্দুকটা একটা কলার মতো বাঁকা তল্‌তলে। তুমি যদি জানো কি করে তৈরী হয়, একটা কলা...ফাব্রিক্‌ নাশিওনালের গোঁজালি কিনা জানতে হয় নাকি! কিন্তু আমার তো কাজ হাসিল হল না।

"যাক্‌, ব্যাপারটা বড়োই খারাপ হল। একটু ঝোল রুটি খেয়ে নিলুম। মনে হল ফুটো হয়ে গেছি। তারপরে এলুম আরমাঁর বাড়ী, জানো তো, আমার দলের কমাণ্ডাণ্ট্‌। মাগো, তাকেও তো সব বলতে হবে। তারপরেই বা কি করতে হবে তাও জানা তো দরকার।

"তার বাড়ীতে এলুম। সে তখন ছিল না। তোমায় বলা দরকার যে বেআইনীর আগে থেকেই তার সঙ্গে আমার চেনা ছিল। তাই তার স্ত্রী আমায় ভেতরে ডাকল। আবার সে আমায় ঝোল খেতে দিলে। আমার তখনও গলা ঘড়ঘড় করছে। কিন্তু তাকে তো আর সে কথা বলতে পারি না, বুঝছই তো। এক একবার মনে হচ্ছিল সব বলে ফেলি নাম করে করে।

"শেষে আরমাঁ এসে পড়ল। ওর বউ বেরিয়ে গেল।

"'ভালো কাজ করেছ আরসেন্‌!'—আমায় সে বল্লে।

"আমি তার দিকে তাকালুম।

"তুমি আমার দিকে নল চালাতে পারো—আমি বল্লুম—এই তো পাইপ :

"'তোমার নল নিয়ে আমি কি করব'—সে বল্লে—'একবার তো গুলি চলে মোটে।'

"হ্যাঁ—আমি বল্লুম—কিন্তু আবার চালাবার দরকার হলেও যে চলে না।

"সে বল্লে, 'কি, আবার চালাবার?'

"বেন্‌,—আমি বল্লুম—হ্যাঁ যদি আরেকবার ছুঁড়তে না পেরে থাকি, সে শুধু এই পাইপটার জন্যে, আটকে গেল বলে।

"'কি রকম, আরেকবার ছুঁড়বে'—সে বল্লে।

"হ্যাঁ—আমি বল্লুম।

"'হে ভগবান!'—সে বলে উঠল। আর ব্যাঙ্গোর মতো চোখ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি বল্লুম—কেন, বেন্‌ কি হল?

"'হে ভগবান!' সে আবার বল্লে আর আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইল—'তুমি একটা গুলিই ছুঁড়েছ?'

"জাহান্নম!—আমি বল্লুম।

"বেন্‌ বল্লে—'ওর বুকে ঢুকে গিয়েছিল।'

"আহা তাই বল জিম্‌। আমিই দেখছি কুপোকাৎ হয়েছি।

"ঐ পাইপটা, ওটা খারাপ ইস্পাতে তৈরী বটে, কিন্তু কলটা ভালো।

"যাই হোক্‌, পাইপটা দেখছি এমন কিছু খারাপ নয়।"

খরা—১৯৭২

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

লাভাস্রোতে মহাকাল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
প্রতিবেশী সূর্যলোকে।
জরাগ্রস্ত জীবন
কলঙ্কের ছাপ খোঁজে
তুষারের চোখে।
নষ্টনীড় পাখী আজ
কৃষ্ণচূড়া ফেলে রেখে
খোঁজে শুধু মানুষের হাড়।

চোখ দিয়ে জল পড়ে
বউ ছেলে গেছে মরে,
ওই দূরে গোলাপের ঝাড়।

* * *

বসন্ত আসেনি আর
রৌদ্রের চমকে,
সন্ধ্যার শেষ ধোঁয়া
ঊর্বশী ঠমকে।

বাঁধেনিকো রোদ্দুর
সুতো দিয়ে দোলনা,
মৃত্যুকে বলে শুধু
"দ্বার তুই খোল্ না।"

মনেতে জাহাজ ডোবে
ওঠো ওঠো খোল দ্বার,
যেতে হবে ভিন গাঁয়ে
হতে হবে নদী পার।

এই সেই মেঠো পথ
ধানভাঙা রোদ্দুর
পায়ের শেকল ছেঁড়ে
সেই গাঁ কদ্দুর?

তন্দ্রা ছড়িয়ে যায়
আকাশের চাঁদেতে
নেমে আসে কালো ছায়া
পাখী পড়ে ফাঁদেতে।

* * *

জ্যোৎস্নার হাওয়ায় ওড়ে দূর দিগন্তের নক্ষত্র
সারি সারি।
স্তব্ধ অতীত কথা বলে,
জিঘাংসার কলরোল অন্ধকারে,
সমুদ্রের বুকে
নীল জলে আগুন জ্বলে।
পাথরের দ্বীপে মৃত বক
সাদা পালক
গাঙচিলের শব।

উজ্জ্বল ঝিনুকে ভাসে শতাব্দীর রক্তস্নাত
বেলাভূমি
গ্রামের মাটিতে আজ ঘরে ঘরে জাহাজডুবি।

* * *

"মাঠ ফেটে চৌচির
বীজধান খেয়ে যায়,
মহাজন কড়া নাড়ে
বেঁচে থাকা হবে দায়।"

"আমরা তো মরি ভাই
বছরেতে বারোবার,
মৃতের পাহাড় তাই
মনে হয় ঝোপঝাড়।"

নদীতেও জল নেই
ভরে ওঠে মজা খাল
মানুষের খুলি আর
শিশুদের কঙ্কাল।

"ওই দূরে দেখা যায়
রিলিফের ছাউনি,
হাজার বছর পার
মৃত্যু কি চাওনি?"

"বছর বছর গ্রাম
ঘরদোর ছারখার
এবার জ্বলবে দেশ
মনে রেখো সরকার।"

বারুদের গন্ধ
শিমুলের লাল সাজ
বেনের স্বর্গ নীল
চাবুক মারবে বাজ।

"বুকেতে দারুণ জ্বালা
কোথা জল কোথা জল,
কেন ভাই চোখ আছে
সেখানে তো আছে জল।"

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা ঃ দুটি সূত্র

স্বপন চক্রবর্তী

এক/ধর্মনীতি

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা ছিল তাঁর জীবনদর্শন তথা ধর্মবোধের অনিবার্য উপসংহার। সূচনায় এ কথা বলে নিলেও তর্ক চলে রবীন্দ্রনাথের সঠিক রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে। তিনি কি বিপ্লবী ছিলেন না সংস্কারবাদী? কেউ বলেন তাঁকে খাঁটি বিপ্লবী বুর্জোয়া গণতন্ত্রী,[১] কেউ বা তাঁকে চিহ্নিত করেন সামাজিক গণতন্ত্রের বিরোধী হিসেবে।[২] সমস্যা এখানে প্রগতির যথার্থ সংজ্ঞা নির্ণয় নিয়ে, নতুবা রবীন্দ্রনাথ যে আগগোড়াই গতিধর্মী ছিলেন, এ সম্পর্কে প্রতর্কের অবকাশ সামান্য।

গোড়ায় যাকে বললাম জীবনদর্শন বা ধর্মবোধ, তার একটা সরলীকৃত ফর্মুলার প্রথমেই প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে বৃহৎ বা পূর্ণ বা সর্বকালীন মানবের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের চোখে সেই মানুষের প্রাণ, মনুষ্যত্ব, ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে বিধাতার এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। এই নিয়ম বা বিশ্ব-বিধানের অনুসরণকেই তিনি বলেছিলেন ধর্মনীতি। এই ধর্ম কেবলমাত্র রিলিজন্ নয়, সামাজিক কর্তব্য-তন্ত্রও বটে। মানুষের যে উপলব্ধিকে বলা হ'ল তার প্রাণ, মনুষ্যত্ব, ধর্ম, সেই লক্ষ্যের পথে ধর্ম-নীতিই ধ্রুব আশ্রয়। এই বোধকে আচ্ছন্ন করে যখন সমাজে ধর্মতন্ত্রই প্রবল হয়, যখন পাণ্ডা-পুরুতরাই সমাজের নৈবেদ্য পায়, অথবা যখন সমাজের এক স্তরে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে ধর্ম-নীতি অনাবশ্যক সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্ যা রাষ্ট্রচালনার কাজে পরিত্যাজ্য, তখনই সেই সমাজের অন্তর্লীন ধর্মবুদ্ধি বিকৃত হয় এবং সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংকটের ভিতর দিয়েই মানুষ পুনরায় বুঝতে পারে যে অধর্ম এক পক্ষের বাঁধা গোলামী করে না, সে সবার নিমক খেয়ে সকলেরই ক্ষতি করে। বিপন্ন সমাজে তখন ধর্মরাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা রফা চলতে থাকে।

এই নিখিলব্যাপী ফর্মুলার অমোঘত্বে নিঃসন্দিগ্ধ দেখি রবীন্দ্রনাথকে। এই বিশ্বাসই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা অনুধাবনের প্রথম সূত্র। এই কেন্দ্র ধরেই আবর্তিত হয় তাঁর নানা সময়ের আনুগত্য ও রাজনৈতিক নিবন্ধগুলি। যেমন তিনি সর্বদাই আক্রমণ করছেন প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসগুলিকে, ভেঙে দিতে চাইছেন সেই অচলায়তন যা ধর্মকে দমবন্ধ করে মারছে। এখানে ধর্মনীতি ও ধর্মতন্ত্রের তফাতটি স্মর্তব্য। "ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয়, তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়োলি করিতে থাকে।.....মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[৩] এই পর্যন্ত রবীন্দ্র-

নাথ বড়জোর একজন আইকোনোক্লাস্ট্। এখানে রবীন্দ্রনাথকে 'অপ্রত্যাশিত রকমের নির্মম বিপ্লবী গণতন্ত্রী'[৪] ভাবার কোনো কারণ আমি দেখি না। তবে সংগঠিত ধর্মতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের বিরোধিতা করায় রবীন্দ্রনাথ একজন উদারনৈতিক মানবতাবাদী ও প্রগতিবাদী ছিলেন নিঃসন্দেহে।

এর অপেক্ষা মারাত্মক ধর্মনীতিকে দুর্বলের কল্পনাবিলাস বলে অবজ্ঞা। ডিপ্লোম্যাসিতে ধর্মনীতি 'কার্যহন্তারক দীনতা',[৫] বলনীতির সঙ্গে প্রেমনীতির সম্মিলন হলে নীতির নীতিত্ব বাড়ে কিন্তু বলের বলত্ব কমে যায়, এই ধরনের বিশ্বাসই রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে বেশি। ধর্মনিয়ম যেহেতু এক অলঙ্ঘনীয় শর্ত, সেহেতু সমাজের এক বিশেষ স্তরে এর অবমাননা হিতকর, এরকম ভাবাটা চিন্তার চরম অসঙ্গতি। "ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভই লাভ একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।"[৬]

পাশ্চাত্ত্য পেট্রিয়াটিজ্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ধর্মনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির অনুরূপ দ্বৈরথ। "জোর যার মুলুক তার" নীতির সমর্থনে যে স্বজাতিপূজার মানসিক পটভূমিকা ছিল তার বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতরূপে প্রগতিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। দেশপ্রেমের সঙ্গে স্বজাতিকতা এই প্রভেদ নির্ণয়ের ব্যপারে এবং ন্যাশান্যালিজ্মের আদর্শকে সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে ধরতে রবীন্দ্রনাথের মত তৎকালীন আর কোনো রাষ্ট্রনেতা সফল হন নি। আমাদের প্রাথমিক ফর্মুলার সেই পূর্ণ মানবের আদর্শের কথা যদি আমরা মনে রাখি তবে এটা সহজেই বুঝব রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম সর্বজাতিকতার দিকে প্রবাহিত হতে বাধ্য। "যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে।"[৭] এই বিশ্বনেশনতন্ত্রের পথে য়ুরোপীয় নেশনতন্ত্র কিভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এক দুরত্যয় বাধা, তা আমরা দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন ইতিহাস অনুধাবন করলেই টের পাব। কিন্তু রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মনীতির অশ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল অন্য কারণে। দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মধ্যে যে উগ্রপন্থী প্রবণতা বারবার দেখেছিলেন তিনি, সেটাই তাঁকে ভাবিয়ে নিয়ে গেছে চরমনীতির গোড়ার সমস্যায়। বয়কট আন্দোলনের সময় কাপড় পোড়ানো এবং পরে বোমাগুলির বিক্ষিপ্ত ব্যবহার, গুপ্তহত্যা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাই বারবার মুখর দেখি রবীন্দ্রনাথকে। দেশের ধর্মবুদ্ধিকে বিকৃত করে, অন্যায়কে ন্যায়ের আসনে বসিয়ে দেশের চূড়ান্ত মঙ্গল অসম্ভব—নির্ব্যাজ নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিশ্বাসের প্রতি আসক্ত থাকাতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ন তিনি। অবশেষে বলতে হয় তাঁকে 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের সমালোচনার উত্তরে, "দেশকে আমিও ভালোবাসি, তা যদি না হ'ত তবে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হ'ত না।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে একপক্ষ অতিশয়পন্থার আশ্রয় নিলে প্রতিপক্ষ সেই টানে আপনি চরমে চড়ে যায়। তাই একপক্ষকে বহুদিন ধরে নিরস্ত্র ও অনুপায় রাখাও কার্যত এক ধরনের চরমনীতি যার চাপে ধর্মবুদ্ধির বিকৃতি এবং চরমপন্থী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। চরমপন্থার ব্যাপারটা তবে সেই বিশ্বনিয়মেরই এক অনুসিদ্ধান্ত। তবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বলপ্রয়োগ প্রসঙ্গে কেন এই নীতিবায়ুগ্রস্ত বিরোধিতা? কারণটা এই যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই চেয়েছিলেন পাপকে ভিতর থেকে মারতে, অধৈর্য হয়ে বাইরে থেকে মানুষ মারতে তিনি চান নি। তাই উগ্রপন্থীদের উচক্কা তাণ্ডব তাঁকে যেমন দুঃখ দেয়, তেমনি আবার চরকা প্রভৃতি সস্তা শর্টকার্টেরও তিনি আপোষহীন বিরোধী। তিনি বুঝেছিলেন যে পরাধীনতা কোনো বাইরের চাপিয়ে দেওয়া বোঝা নয়, আমাদের অন্তর্মূল পরনির্ভর মনোবৃত্তিরই বাহ্যিক প্রতিফলন। তাই তিনি ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে আত্মশক্তি উদ্বোধনের ভেতর দিয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই বেশি আগ্রহী। এইখানে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য রেখে যান তিনি :

"পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই।.....সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব।"[৯] কিন্তু এবারে আমরা সরে আসছি আমাদের প্রথম সূত্র থেকে, পৌঁছে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় সূত্রে।

কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা শুরুর আগে একটা কথা সেরে নেওয়া ভালো। বুর্জোয়া সংস্কৃতির একটি অনিবার্য লক্ষণ এই যে কল্পান্তের মুখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক ভয় ফুটে বেরোয়। কিন্তু পরিবর্তনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মন মনে হয় স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দিত। রাশিয়ায় এক সংক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে পড়েও মুগ্ধ হবার মত মনের বলিষ্ঠতা ও পূর্বের ধারণাগুলির সংস্কার করার মত সততা তাঁর ছিল। "গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। সেদিকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তাঁকে অনেক অগ্রসর মনে হয়।"[১০] এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে আমি পারি না।

কিন্তু এই মুগ্ধ হয়ে পড়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এই ভাঙাগড়াকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারে নি। মানুষের স্বাতন্ত্র্যের নামে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও বিধাতার অভিপ্রেত বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করা—এই ছিল 'রাশিয়ার চিঠি'তে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল সুর। মানুষের দুটো দিক আছে—একদিকে সে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে সে সামাজিক জীব। মার্কসীয় অর্থনীতি দ্বিতীয়টির উপরে বেশি ঝোঁক দেওয়ায় মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটে নি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কথা। এ'ও সেই সঙ্গে বলেন তিনি যে, "সে হিসাবে এরা (কম্যুনিস্টরা) ফ্যাসিস্টদেরই মতো।"[১১]

কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবকে পরিবর্তনের বাহন হিসাবে ব্যবহারে রাশিয়ার সাফল্য তিনি দেখে, মেনে নিয়েও যেন মানতে পারলেন না। 'কালান্তরে' পৌঁছে বলেন তিনি : "ইদানিং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্‌, ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদযোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল।..... রাশিয়ার জারতন্ত্র বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোঁড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি।"[১২] রাশিয়ায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে কথাটা যথার্থ নয়। কাঁটাগাছ মরার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের সারি জন্মায় নি, কারণ মাটিটাই বদল হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মূল প্রেরণা কোথায়, সে সমস্যার নিহিত ব্যাখ্যাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

দুই/সমাজ ও রাষ্ট্র

আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথায় এসে পড়া মাত্র আমরা নির্দেশ পাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা অনুসরণের দ্বিতীয় জরুরী সূত্রটির। রবীন্দ্রনাথ সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি প্রভেদ নির্দিষ্ট করেছিলেন। এখানে সমাজ বলতে কম্যুনিটি এবং রাষ্ট্র বলতে স্টেট্‌ বুঝতে হবে। এই দুই শক্তির গঠনতন্ত্র ও কর্তব্যকে সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেবার মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মূল নিহিত ছিল। পাশ্চাত্ত্যে সমাজের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার ছিল স্টেটের হাতে ন্যস্ত, কিন্তু ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব ছিল কম্যুনিটির ওপর, রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যবস্থাতন্ত্রের ওপর। নানা সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের মাঝখানেও তাই ভারতীয় সমাজ অনন্যভাবে টিঁকে ছিল। রাজনৈতিক পালাবদল মানেই সামাজিক পরিবর্তন, এরকম ধারণা তাই একান্ত য়ুরোপীয়।[১৩] য়ুরোপে তাই পলিটিক্সই দেশের জীবনের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু ভারতবর্ষে তা নয়।

রবীন্দ্রনাথের নানা সময়কার অর্থনৈতিক ধারণা এবং কাজ—'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ বা শ্রীনিকেতন—দাঁড়িয়ে আছে এই সনাতন আদর্শের ভিত্তিতে। এই আদর্শের তাগিদেই বারবার তাঁকে বলতে শুনি, আত্মশক্তি উদ্বোধিত করো, বাংলার গ্রামকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও মহামারী থেকে উদ্ধার করো, পল্লীর শ্রী ফিরিয়ে আনো, শক্তির সমবায় ও সম্মিলনেই সমৃদ্ধি এটা বোঝো, রাজদ্বারে গলায় কাছা দিয়ে ভিক্ষা করার বদলে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, অন্তরের দাসত্ব এবং পরনির্ভরতার অভ্যাস পরিত্যাগ করো।

এই সূত্রটির সন্ধান পেতে রবীন্দ্রনাথের পাঠককে বেশিদূর যেতে হয় না। 'আত্মশক্তি' থেকে 'কালান্তর' পর্যন্ত এতবার এতভাবে এ কথা বলেছেন তিনি যে সন্দেহ হয় যে তাঁর এই কথা বোধহয় তখনকার দিনে কারো মনে ধরে নি। কিন্তু আরেকটু অভিনিবেশ প্রয়োজন হয় এই সূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির যোগ ধরে নিতে।

গ্রামের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বাস্তবপন্থী ছিলেন না, এমন কথা আমার সত্য বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পবিপ্লবোত্তর উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষকে যে রফা করতে হবে এ কথা তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। যন্ত্রের সমীচীন ব্যবহার যে মানুষের সম্পদ ও অবসরকে প্রসারিত করবে এও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যন্ত্রের দাসত্বের মধ্যে যে সর্বনাশ আছে তার আশঙ্কাই হয়ে ওঠে তাঁর কিছু নাটক ও কবিতার মুখ্য উপজীব্য।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে এই যন্ত্রের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী (মার্কসের এলিয়েনেশন তত্ত্ব স্মর্তব্য) এরকম সুস্পষ্ট কথা অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথে আশা করি না। অবশ্য দীর্ঘকাল গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকায় সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি লক্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। "আমেরিকায় যেসব শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমন করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।"[১৪] আইনকে যে প্রবলপক্ষ নিজের সুবিধায় ব্যবহার করতে পারে এ কথাও একই সঙ্গে বলেন তিনি। অতএব রায়তকে বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে উঠতেই হবে উদ্ধার পেতে হলে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়ার ব্যাধি যাই হোক না কেন, তার কুফল অতএব সঠিক বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাণিজ্যদানব ক্রমশঃই মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ গ্রাস করে নিচ্ছে, তৈরী করছে এক বিরাট দাসসম্প্রদায় আর এ সবই হচ্ছে অল্প কয়জনের আরাম ও স্বার্থসাধনের জন্য—মোটামুটি এটাই হচ্ছে প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী শিবিরের কথা। আর এই কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন রবীন্দ্রনাথ 'জাপানযাত্রী' বইয়ে। এও বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য চাই ভিন্নতর উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা। রাশিয়ার নূতন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক পেট্রভকে প্রেরিত তাঁর তারবার্তাটি স্মরণীয়: "Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity."[১৫]

লক্ষ্য করবার মত বিষয় হ'ল এটা যে বাণিজ্য-দানবের স্ফীতি ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন রিপুর তাড়নার উপর। উপনিষদের শিক্ষাবলী দ্বারা আজীবন অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এটা অবশ্য প্রত্যাশিত। কিন্তু এই সনাতন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠার পেছনে কোন হেতু কাজ করছে এই প্রশ্ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নীরব। তাঁর ধারণায় তিনি সমস্যার মূলে পৌঁছে-ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু আধুনিক প্রগতিবাদীর পক্ষে তাঁর বিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

মানুষের সম্পদকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির কল্যাণে ফেরাতে কি পথ নে'ন রবীন্দ্রনাথ? এ কথা খুব স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেন তিনি যে সাময়িক দাক্ষিণ্য কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। ভালো একটা বাসস্থান দিয়ে, দু-চামচ সুপ খাইয়ে বা শীতের

দিনে দুটো উদ্বৃত্ত গরম কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে শ্রমজীবীদের বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

"তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনো-মতে ঠেকা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

"তাই ও-দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না-দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে, তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।..."[১৬]

সাময়িক সংস্কার নয় তবে চিরকালের ব্যবস্থা। যে অসাম্যের ব্যাধি বিপ্লব ঘটায়, ধনীর অনুগ্রহের ছিঁটেফোঁটায় সে অসাম্য ঘুচবার নয়।

অথচ মার্কসীয় বিপ্লবতত্ত্বের সফল প্রয়োগ দেখেও তাঁর মন সায় দেয় না তাতে। মানুষের দুটি দিকের মধ্যে একটিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় মার্কসীয় তত্ত্ব ভারসাম্য হারিয়েছে—এই ধারণার কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পত্তিকে দেখেছিলেন মানুষের স্বতন্ত্র দিকটির প্রকাশের এক উপায় হিসাবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তির চেষ্টায় মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যক্তিমানুষ অপেক্ষা সামাজিক বা অর্থনৈতিক মানুষকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। তাঁর মতে সম্পত্তির প্রতি মমতা সংস্কারগত, ওটা তর্কের বিষয় নয়। আমার মনে হয় বলশেভিক তত্ত্বের দুর্বলতার মূল অনুধাবনে আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিলেও এইখানে এসে রবীন্দ্রনাথ যুক্তির ভারসাম্য হারান। মানুষের 'পোসেসিভ' প্রবণতাকে 'ক্রিয়েটিভ' প্রবণতার দিকে প্রবাহিত করার মধ্যে যে সামাজিক মঙ্গল সূচিত হয় এ কথা তিনি জেনেও যেন ভুলে গেলেন। কেবলমাত্র সমবায়নীতির জয়গান গেয়েই অতঃপর শেষ হ'ল তাঁর অর্থনৈতিক বক্তব্য।[১৭] ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থনে 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের মত এইরকম সেন্টিমেন্টসর্বস্ব মনোভাব যখন দেখান তিনি, তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা, এইরকম অস্বস্তিকর সংশয় মনে জাগে।

"এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে আমি মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।"[১৮]

ফিরে আসি দ্বিতীয় সূত্রে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পত্তির সামঞ্জস্য খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন হিন্দু সমাজে। সেখানে গ্রামে গ্রামে ধনীর ভোগের সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল, তাকে উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্যয় করতে হ'ত দেশের কল্যাণে। এর থেকেই রক্ষিত হ'ত গ্রামের পথঘাট, পানীয়, চিকিৎসা, শিক্ষা, পূজাপার্বণ ও যাত্রাগানে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কল্যাণসম্বন্ধ, বলেছেন ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ। এটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার যে এটা কোনো অনুগ্রহ বা দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। এটা ছিল ধনীর এক-প্রকার খাজনা, এর আদর্শ ছিল অনেকটা আধুনিক ওয়েলফেয়ার স্টেটের অনুরূপ। কিন্তু এটা এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই কল্যাণকর্ম ও সামাজিক দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রিক যন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এতে কোনো বর্হিশক্তি, ল অ্যান্ড অর্ডার বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের চাপ ছিল না, এটা ছিল মানুষের ইচ্ছাবাহিত।

এতক্ষণে আমরা খুঁজে পাচ্ছি দ্বিতীয় সূত্রটির সঙ্গে আমাদের প্রথম সূত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। যেহেতু এই সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র ছিল সমাজের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, তাই এর মধ্যে একটা ধর্মসাধনার ব্যাপার ছিল। অতএব কুল-দেবতা, কুলধর্ম, কুলগৌরব ইত্যাদি ধারণার কথা আমরা শুনতে পাই। এর পরিণামে আত্মিক উৎকর্ষের চর্চা ছিল সমাজের সমস্ত কাজে। "এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।"[১৯] অর্থাৎ আবার আমরা ফিরে গেলাম রবীন্দ্রনাথের গোড়ার ধর্মবোধে, যার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক ভাবনা।

তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, যে দুটি সূত্রের

সন্ধান আমরা পেলাম তা মানবপ্রকৃতির দুই প্রান্ত এবং তার মধ্যবর্তী সেতুকে নির্দিষ্ট করছে। ধর্ম-নীতি ব্যক্তিমানুষের ধ্রুব আশ্রয় এবং সমাজ সামাজিক মানুষের সাধনার অপরিহার্য ক্ষেত্র। আবার একই সঙ্গে ধর্মনীতি হয়ে উঠছে একটি সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, এবং রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র এক সামাজিক ব্যবস্থাও হয়ে উঠছে ব্যক্তিমানুষের অন্তরের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র। যন্ত্রযুগের নতুন উৎপাদন প্রণালীকে মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে সংগঠিত করতে হবে, এদিকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ যেন কোনোভাবে বাধা-প্রাপ্ত না হয় সেটাও দেখতে হবে—এই বিপরীত প্রান্ত দুটির মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন এক ভারসাম্যের কেন্দ্র। বিরল অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই প্রস্তাবিত কেন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারলেন না কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর। তাঁর সাধনার ক্ষেত্রও হয়তো ছিল না ওটা। তবু রাজনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত এই দুটি প্রাসঙ্গিক সূত্র আবিষ্কারে ও প্রস্তাবিত সমাধানগুলির দুর্বলতা অনুধাবনে রবীন্দ্রনাথ যে সহজাত বিচক্ষণতার পরিচয় রেখে গেছেন, আধুনিক মনন-বাদীর কাছে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

সূত্র নির্দেশ/টীকা

১। এস. এ. ডাঙ্গে : **রবীন্দ্রনাথ : সংস্কারবাদী না বিপ্লবী**, নতুন সাহিত্য (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা), পৃ-১৭১

২। রবীন্দ্র গুপ্ত : **বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা**, মার্কসবাদী (৫ নং), পৃ-১৫১

৩। **কর্তার ইচ্ছায় কর্ম**, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৩৫১), পৃ ৫৫৪-৫৫৫

৪। এস. এ. ডাঙ্গে : **রবীন্দ্রনাথ : সংস্কারবাদী না বিপ্লবী**, নতুন সাহিত্য (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা), পৃ-১৭১

৫। **রাজা প্রজা**, র. র., ১০, পৃ-৪৪৯

৬। **সমূহ**, র. র., ১০, পৃ-৬৪২

৭। **কালান্তর**, র. র., ২৪, পৃ-৪০৮

৮। **ঘরে বাইরে** উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয়, র. র., ৮, পৃ-৫২৬

৯। **কালান্তর**, র. র., ২৪, পৃ-৩২৬

১০। সুশোভন সরকার : **রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি, নতুন** সাহিত্য (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা), পৃ-৪১। পুরো অনুচ্ছেদটির জন্য লেখক এই প্রবন্ধের কাছে ঋণী।

১১। **রাশিয়ার চিঠি**, র. র., ২০, পৃ-৩২৮

১২। **কালান্তর**, র. র., ২৪, পৃ-৪২৬

১৩। কার্ল মার্কসের দুটি উক্তি প্রাসঙ্গিক :

Do not say that social movement excludes political movement. There is never a political movement which is not at the same time social.

The poverty of Philosophy, (Moscow, n.d.), p. 196.

From the political point of view the state and any organisation of society are not two distinct things. The state is the organisation of society.

Early Texts, ed. D. McLellan, (Oxford, 1971), p. 213.

১৪। **কালান্তর**, র. র., ২৪, পৃ-৪২৯

১৫। **রাশিয়ার চিঠি**-র গ্রন্থপরিচয়, র. র., ২০, পৃ-৪৫৪

১৬। **কালান্তর**, র. র., ২৪, পৃ-২৬৪

১৭। এ কারণে যদি মার্কসীয় সমালোচকরা রবীন্দ্র-নাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে থাকেন তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। উৎসাহী পাঠক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসের উক্তির আলোকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

Why, those members of the ruling classes who are intelligent enough to perceive the impossibility of continuing the present system . . . . have become the obtrusive and full-mouthed apostles of co-operative production. If co-operative production is not to remain a sham and a snare ; . . . . if united co-operative societies are to regulate national production upon a common plan, thus taking it under their own control, and putting an end to the constant anarchy and periodical convulsions which are the fatality of capitalist production—what else, gentlemen, would it be but Communism . . . ?

The Civil War in France, Selected Works, Vol. 1, (Moscow, 1935), p. 523.

১৮। **রাশিয়ার চিঠি**, র. র., ২০, পৃ-২৯৩

১৯। **রাশিয়ার চিঠি**, পৃ-৩৪৬

শরৎচন্দ্র ঃ ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব

তপোব্রত ঘোষ

(১)

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ বিশ বছরে (১৯১৭-১৯৩৭) রচিত বেশীর ভাগ উপন্যাসের অন্তরঙ্গে লক্ষ্য করা যায় দুই বিরোধী শক্তির এক বিস্ময়কর নিঃশব্দ সংগ্রাম। বলা যায় এই পর্যায়ের প্রায় সব প্রধান নারী চরিত্রগুলিই এই নিঃশব্দ অথচ নিশ্চিত সংগ্রামের প্রেক্ষাপট। সমাজ এবং ব্যক্তি এই সংগ্রামের দুই বিরোধী শক্তি। এই পর্যায়ের কয়েকটি নারীর দিকে তাকালে যে অস্বাভাবিক দীপ্তি চোখে বারবারই ধাঁধা লাগায়, ('কিরণময়ী' চরিত্রটি প্রথম যখন উপন্যাসের মধ্যে এসেছে, সেই দৃশ্যটি স্মর্তব্য) সেই দীপ্তির মূলে আছে তাদের জীবনেরই দুই দ্বান্দ্বিক ভারকেন্দ্রের পরস্পর-বিরোধী ঘাত প্রতিঘাত। তারা প্রত্যেকেই সমাজের অন্ধ দেয়ালগুলোকে ভেঙ্গে বাইরে আসতে চেয়েছে, তাদের ব্যক্তিত্বের ভাঁজগুলো খুলে ধরতে চেয়েছে খোলা আকাশের নীচে। কিন্তু তাদের ঐ 'চাওয়া' কখনও পরিপূর্ণ 'পাওয়া' হয়ে ওঠে নি—এর জন্য সমাজের বাধা যত না বেশী, তাদের নিজেদের বাধা কম নয়। চরিত্রগুলি সমাজের অবিচার এবং নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছে, কিন্তু অবাক হ'তে হয় যখন দেখি সেই মুহূর্তেই তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক অনভিপ্রেত পিছুটান। তাদের অগ্রগতির সরলরেখাটিতে মাঝপথেই দেখা গেছে একটি আবর্ত—তাদের পথ বেঁকে গিয়েছে, সেই পথেই তাদের ক্লান্ত প্রত্যাবর্তন সেই পরিত্যক্ত সমাজেরই সিংদরোজায়।

শরৎচন্দ্রের এই পর্যায়ের বেশীর ভাগ নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে আমরা শুধু হৃদয়বৃত্তিকেই দেখি না, বুদ্ধির শাণিত ঔজ্জ্বল্যও দেখি। ১৯১৭ সনে কিরণময়ীর মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে বুদ্ধিবাদের সূচনা, সেই বুদ্ধিবাদ ঊর্ধ্বায়িত হ'তে হ'তে ১৯৩১-এ 'শেষ প্রশ্নে' শেষ হয়েছে। সেখানে বুদ্ধির দীপ্তি এত বেড়ে গেছে যে দীপ্তি-ই হয়ে পড়েছে প্রধান, চরিত্র গৌণ। কিন্তু এই বুদ্ধিবাদ যত প্রবলই হোক না কেন, ঐ নারীচরিত্রগুলির মূল ভিত্তি হৃদয়বৃত্তি। বুদ্ধি নয়। ঐ হৃদয়ের গভীরেই সমাজের সঙ্গে তাদের বন্ধন অপ্রতিরোধ্য। চরিত্রগুলি তাদের সমগ্র জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অপমানের তীব্র প্রতিক্রিয়াকে সম্বল করে বহিরঙ্গের বুদ্ধি ও যুক্তির তীব্র রশ্মিপাতে সমাজের বিশ্লেষণ করে সমাজনীতির দুর্বল দিকগুলিকে বিদ্রূপ করে এবং অনেক সময়ে সমাজ-নীতির বিরোধিতা করতে চায় :

> "একটি রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান, যা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে তাকেই জোর করে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এতবড় ভালোবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেবো? আমি এভাবে সতী নাম কিনতে চাইনে।"

কিন্তু এই প্রয়াস শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। বুদ্ধির যে নতুন রাস্তা ধরে তারা সমাজের অন্যায় শাসন থেকে মুক্ত হ'তে, প্রাণিত হ'তে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগে, চোখের জলে সেই পথটুকু মুছে ফেলে, পুরানো রাস্তায় ফিরে গেছে। সুতরাং, তাদের ঐ বিদ্রোহ ভিত্তিহীন না হ'লেও, ক্ষণিকের। কোথাও না কোথাও সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল অবধারিত এবং চিরন্তন। সেই আকর্ষণই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এক অচঞ্চল জীবন-কেন্দ্রে। সমাজের প্রতি তাদের বিক্ষোভ খুব প্রবল হ'লেও ঐ অচঞ্চলতাই তাদের মূল চরিত্র।

(২)

শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে তৎকালীন মহিলা সাহিত্যিক লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন : 'আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই—এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য দ্রব্য আছে এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।'

সত্যিই কি যায় না? কিন্তু তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে তাঁর ঐ চরিত্রগুলির এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। আপাতভাবে তাঁর চরিত্রগুলি সমাজদ্রোহী হ'লেও হৃদয়ের নেপথ্যে সমাজ এবং সংস্কারের গভীর প্রভাব যে তাদের মধ্যে অনুস্যূত, সে সম্পর্কে তিনি পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন না। এজন্যই বোধহয় রাধারাণী দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আমার লেখায় সত্যকারের দুর্নীতি কোথাও নেই—এ বিশ্বাস যেন তোমার নিঃসন্দেহ থাকে।" তাঁর চরিত্রগুলির কেন্দ্রীয় দ্বিধার কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে :

"আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে (সমাজনীতিবিরোধী ক্রিয়াকলাপ) লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধহয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য ডিমোনস্ট্রেসন-এ লজ্জা পায়। এ আমার দুর্বলতা।" সুতরাং দেখা গেল যে তাঁর উপন্যাসের এই পর্যায়ে নারী চরিত্রগুলি, সমাজবিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে অজ্ঞাত স্ববিরোধী আকর্ষণে আবার সমাজের বিবরে ফিরে গিয়েছে বা যেতে চেয়েছে, তার মূলে আছে তাদেরই গুহাহিত দুর্বলতা—প্রকারান্তরে যা লেখকেরই দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। এই দুর্বলতা সমাজেরই ঐ 'সুদীর্ঘ সংস্কার'-এর প্রতি, যদিও সেই সংস্কারের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতাকে একদিকে কিরণময়ী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী যেমন জানতো, তাদের স্রষ্টাও কম জানতেন না। সেই সংস্কারকেও তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেনি, আবার অন্যদিকে :

"গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হল মিথ্যে, আর বইয়ের শুক্‌নো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে—সেই হ'ল সত্যি?"

—এই প্রশ্নও সমানভাবে তুলেছেন। তবে কি তিনি মূলতঃ একজন 'পিউরিট্যান' ছিলেন? শরৎচন্দ্রের এই বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের একটি কালগত এবং মানসিক পূর্বসূত্র বর্তমান।

(৩)

১৮৯৫-১৯০৫—মোটামুটি এই সময়টি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই (১৯০২) তিনি রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অধিকাংশই কিম্বদন্তীমূলক, কিন্তু এইটুকু জানা যায় যে রেঙ্গুনে বাসকালেও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ বরাবর বজায় ছিল। এই সময়ে বাংলার পাঠকসমাজে এবং উপন্যাস সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে একধরণের দ্বান্দ্বিক মনোবৃত্তি বজায় ছিল। উপন্যাসের ধারায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিত্বের সবল আত্মপ্রকাশ 'চোখের বালি'তে, এই যুগেই। আবার পরপর, অল্প ব্যবধানে লিখিত 'নৌকাডুবি'তে সমাজশক্তি ও প্রচলিত সংস্কারেরই জয়জয়কার। অন্যদিকে পাঠকসমাজও বঙ্কিমযুগ থেকে বিংশ শতকের সূচনা পর্যন্ত মোটামুটি একই অপরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে চলে এসেছে। কারণ স্রোতহীন, ভাঁটাপড়া শহর ও গ্রামজীবনের শত কুসংস্কারে বন্দী মধ্যযুগীয় কাঠামো তখনও দৃঢ় এবং স্পষ্ট। অথচ বিংশ শতকের সূচনায় কোলকাতার পাশ্চাত্যমুখী নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্মও তখন হয়েছে। একদিকে যুক্তিপ্রবণ মননশীলতায় অন্ধ সংস্কারগুলোর স্বতঃসিদ্ধতা সমালোচিত হয়, অন্যদিকে বিগত গ্রামীণ সংস্কার ও ধারণাগুলো আমাদের নবজাগ্রত ব্যক্তিত্বের উপর ছায়াপাত করে। একদিকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বুদ্ধিকেন্দ্রিক নবযুগের উপন্যাস লেখা হয়েছে এযুগে, অন্যদিকে গণ্ডীবদ্ধ, মিলিয়ে-দেওয়া-

প্লটের কাহিনীরও অভাব হয়নি। নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ দুদিকেই লেখনী চালনা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের মধ্যেও ঐ দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েছে। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি যে সমাজ, নীতি এবং সংস্কারকে অতিক্রম করতে চেয়েছে—হয়তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে করেওছে—সেই পরিত্যক্ত সংস্কার ও সমাজকেই তারা পরমুহূর্তেই দুহাতে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। বলা চলে পুরানো সংস্কার এবং সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতি একই সঙ্গে আপাত-ক্ষুব্ধতা এবং প্রকৃত-মমতার ঐ আশ্চর্য দ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র।

(৪)

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির ঐ যে বিদ্রোহাত্মক মনোবৃত্তি, তা তাদের নিজেদেরই জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। সমাজের যে প্রচণ্ড নিষ্পেষণ তাদের সহ্য করতে হয়েছে, ঐ মনোবৃত্তি সেই নিষ্পেষণের একটি বিকেন্দ্রিত রূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের প্রত্যেকেরই মনের গভীর প্রবণতা ছিল সমাজের প্রতি আনুগত্য। কিরণময়ীর মধ্যে আমরা সমাজ-নীতিদ্রোহিতার একটি চরম প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কিন্তু কিরণময়ীরই উপরের আবরণটি সরিয়ে নিলে স্নেহ, প্রেম ও বিশ্বাসের ব্যর্থ প্রত্যাশী ট্র্যাজিক একটি চরিত্রের দেখা আমরা পাব। জীবনের কোমল প্রারম্ভে, স্বামীর নাস্তিক্য-প্রবণতা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, প্রেমহীন এক দাম্পত্যজীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ ডাক্তারের কামুক বাহুপাশ তার চার পাশে যে পরিবেশটি গড়ে তুলেছে, তা এককথায় অসহনীয়। যেন উত্তপ্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ এক বদ্ধ ঘর। তার নিজের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হাঁপিয়ে যে সংশয়বাদী, দেহবাদী, উগ্র হিংসুক কিরণময়ীর জন্ম হয়, উপেন্দ্র তাকেই বলেছে "পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশু।" অঘোরময়ী কিরণময়ীর মধ্যেই একদিন দেখেছিলেন এই ভয়ংকর দাহের ছবি :

"কিরণময়ী প্রজ্জ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। জ্বলন্ত ইন্ধনের রক্তাভ আলোক প্রচুর পরিমাণে তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অঘোরময়ী দ্বারের সমুখে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ যে বস্তুটি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। যে স্তব্ধ মুখের উপরে উনানের রক্তাভ আলোক বিচিত্র তরঙ্গের মতো খেলিয়া ফিরিতেছিল, সেই মুখ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে।"

আর যেদিন এককথায় সমাজের সবরকম নীতি এবং সংস্কারকে পদাঘাত করে কিরণময়ী তার সমস্ত জ্বালা দিবাকরের শরীরে ঢেলে দিল, সেদিন :

'বাহিরে রুদ্ধ পবন গোঁ গোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং "কিরণময়ীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে.....সে কেমন হ'বে ঠাকুরপো।"

এই আত্মবিধ্বংসী মরুভূমির দিকে ভালো করে তাকালে মাঝে মাঝে তার মধ্যেই গোপন এক ওয়েসিসকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় কিরণময়ীর তীব্র সমাজদ্রোহী মতবাদ এবং কাজ তার আত্মবঞ্চনা, তার এই আপাত রূপের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল, সমাজের প্রতি এক কেন্দ্রানুগ টান। সমাজের কাছেই যে সে পরে ফিরে এসেছে, তা মোটেই বিস্ময়কর নয় :

"কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল : 'আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার উপীনদা কি বৌকে বড্ড ভালোবাসেন?'

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল : 'ওঃ—ভয়ানক ভালবাসেন।'

কিরণময়ী চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল : ছোট-বৌকে দেখতে কেমন? খুব সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দরী।'

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমার মতন?'"

তার কথার মধ্য দিয়েই যে রূপটি আভাষিত হচ্ছে, সে রূপ তার বহিঃরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার প্রত্যাশিত জীবন ছিল এক অচঞ্চল, শান্ত ও সমাজ-

অনুমোদিত জীবন। কিন্তু তার দীর্ঘ বিবাহিত জীবন তাকে বিকৃত করে তুলেছে। যে শক্তিতে সে একরাত্রির মধ্যে দীর্ঘকালের সংস্কার পায়ে দ'লে গৃহত্যাগ করেছে, সে জানতো না, তার চেয়েও বড় এক বিপরীত শক্তি তার নিজেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন। সেই শক্তি সমাজের শক্তি, সংস্কারের শক্তি। সেই শক্তি যে তার মধ্যে কত বড়, তা বুঝতে পারি যখন দেখি তার মতো একটি কঠিন চরিত্রও, ঐ শক্তির উজ্জীবনে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে—পাগল হয়ে গেছে। যে চরিত্রটি তীক্ষ্ন মননের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল, তাকেই শেষ পর্যন্ত দেখলাম উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায়, মননহীন, যুক্তিহীন এক বিশ্বাসের ধ্বসরতায় :

"আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে, একটু খাবে? হয়তো ভালো হ'য়ে যাবে। শুনেছি এমন কতলোকে ভালো হয়ে গেছে।"

এই বিশ্বাসই তার চরিত্রের গোপন সত্য। এই বিশ্বাসের পথ ধরেই তার প্রত্যাবর্তন সমাজের ফেলে আসা পথে।

(৫)

অভয়া সমাজ এবং বিবাহের সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে শ্রীকান্তের সামনে যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে—একদিক দিয়ে তার তীব্রতা অনতিক্রম্য, অন্যদিক দিয়ে ঐ বিক্ষোভের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা এত বেশী স্পষ্ট যে 'অভয়া' চরিত্রটির অন্তরঙ্গ স্বরূপটিকে একমুহূর্তেই চিনে নিতে পারা যায়। অন্য একদিক দিয়ে অভয়ার ঐ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের নিজের সমাজের ও সংস্কারের প্রতি দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভয়া দুশ্চরিত্র স্বামীর নির্দয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং যে বিবাহের অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ স্বামীর ক্ষেত্রে শুধু নিরর্থক প্রলাপের মতো হারিয়ে যায় শূন্যে, সেই 'বিবাহের বৈদিক-মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্য বজায় থাকে কি না' সেই প্রশ্নও অকুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছে। সমাজের বিরুদ্ধে তার ঐ জিজ্ঞাসাকে রোহিণীবাবুর মাধ্যমে সে ফুলে ফলে সার্থক করে নিতে চায়।

কিন্তু অভয়া রোহিণীবাবুর সঙ্গে যখন প্রথম গৃহত্যাগ করেছে, তখন সে তার সাময়িক অবলম্বন মাত্র—আশ্রয় নয়। তার আশ্রয় সেই স্বামীই, যার সঙ্গে তার 'অর্থহীন বৈদিক মন্ত্রের' সম্পর্ক। সেই আশ্রয় ভেঙ্গে যাওয়াতেই তার আবেগ, বুদ্ধির সংযোগে তীব্র বিদ্রোহের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এই মনোবৃত্তি তার প্রকৃত চরিত্র নয়—তার যোগসূত্র যে চিরকালের সংস্কারের শিকলে শত-পাকে বাঁধা। তারই একটু আভাষ :

> "রোহিণীর দরজার কড়া ধরিয়া বার দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি সমুখে অভয়া। অভয়ার চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্টালোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না।"

অভয়ার বাইরের রূপ তাই যে বিদ্রোহাত্মক মনো-বৃত্তির ইঙ্গিত দেয়, তার প্রকৃত রূপ ঠিক সেই বাইরের রূপের বিপরীত। সেই বিপরীত বিন্দুতে যে অভয়াকে দেখি, সে বিদ্রোহী নয়, বিবাহমন্ত্রকে সে অস্বীকার করে না। স্বামীর নিষ্ঠুরতাকেও সে সমাজশক্তির প্রভাবে নিঃশেষে স্বীকার করে নেয়।

আর এইসঙ্গেই শরৎচন্দ্রের নিজের প্রবণতাটিও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যে অভয়ার ঐ বিদ্রোহকে অস্বীকার করেছেন তা নয়, আবার সম্পূর্ণ স্বীকারও তিনি করতে পারেন নি। একক ব্যক্তির প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রবল হলেও সমাজশক্তির অন্ধ সংস্কার যে তার ক্ষেত্রেও কতখানি দুশ্চেদ্য—তা বুঝতে পারি অভয়ার প্রতি শ্রীকান্তের কথায় :

> "অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়তো নিষ্পাপ, কিন্তু মানুষ তো মানুষের অন্তর দেখতে পায় না। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে তো সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।"

এখানে সহৃদয়তা থাকলেও শরৎচন্দ্রের উপর

সমাজের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব স্পষ্টই প্রকাশিত হয়েছে।

(৬)

"কমল এঞ্জিনের বাঁশী, হৃদয়স্পন্দন নয়"—সমালোচকের এই মন্তব্য স্বীকার করেও যদি তথাকথিত নিষ্প্রাণ ঝক্‌ঝকে এক যান্ত্রিক মতবাদের বিজ্ঞাপন এই চরিত্রটির দিকে আরও গভীরভাবে তাকানো যায়, তবে কি অংশতঃ একটা হৃদয়ের দেখাও আমরা পাই না? 'অংশতঃ' কথাটি বলবার কারণ হ'ল এই যে ১৯১৭-র পর থেকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বুদ্ধিবৃত্তির যে উন্মেষ শুরু হয়েছিল, কমল সেই ধারারই শেষ বিন্দু যেখানে বুদ্ধির প্রাধান্য বেশী, হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কম। কিন্তু কম হ'লেও একেবারে হারায় নি। আর সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হ'ল পূর্বের চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও অবশেষে সমাজশক্তির জয় ঘটেছে, কমলের "বুদ্ধির ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের" তলায় যেটুকু হৃদয়ের স্ফুরণ ঘটেছে, সেখানেও ঐ একই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সমাজশক্তির জয় ঘটেছে। অর্থাৎ কমলের ক্ষণিকবাদ তার তর্কে জয়ী হলেও তার জীবনে শেষপর্যন্ত সমাজশক্তিরই পরোক্ষ জয় ঘটেছে। কমল মানুষের মনের ক্ষণিক উপলব্ধিগুলোকে সত্যের মানদণ্ড ধরে নিয়ে যে শেষপ্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে—তার বিপরীত পথেই রাজেনের সত্য-পরিক্রমা। কমল বলেছে : "মত আর কর্ম দুইই বাইরের জিনিষ রাজেন, মনটিই সত্য", অন্যদিকে রাজেন বলেছে : "কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারিক ঐক্যই বড়, হৃদয় নয়।" এই 'কর্মের জগত'ই হ'ল সমাজ এবং 'ব্যবহারিক ঐক্য' হ'ল সমাজের শক্তি। কমলের সমাজ-নিরপেক্ষ ক্ষণিকবাদ, রাজেনের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমাজশক্তির সামনে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। পূর্বের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের যে গভীর ট্র্যাজেডী মূর্ত হয়ে উঠেছে, কমলের মধ্যে সেই ট্র্যাজেডী সেরকম প্রকাশ না পেলে, তার বুদ্ধিদীপ্ত, একমুখী মনে স্পষ্টতঃ একটি শ্রান্তির সুরকে ধ্বনিত করে তুলেছে : "কমল কহিল : 'জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মতো মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অত নিষ্ঠুর আমি নই...দুনিয়ার সব আঘাত থেকে তোমায় আড়ালে রেখে একদিন যেন আমি মরতে পারি।'"

এই একটি কথার মধ্য দিয়েই কমলের হৃদয় তীক্ষ্ণ সমাজদ্রোহী নিষ্প্রাণ বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করে যে পথে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে, সেই পথেই কিরণময়ী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী প্রত্যেককে ফিরে আসতে হয়েছে।

সেই পথ তাদেরই পরিত্যক্ত সমাজের পথ।

(৭)

অনেকের মতে, শরৎচন্দ্রের এই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে যে ক্রমাগত সমাজশক্তির জয় ঘটে গেছে, তার কারণ শরৎচন্দ্র গোপনে একজন 'পিউরিট্যান' ছিলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ দুর্বলতাকে নিজেই স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র পিউরিট্যান ছিলেন কি না কে কথার চেয়েও বড় হ'ল এই চরিত্রগুলির মধ্যের অপূর্ব মাধুর্য—যা আমাদের মুগ্ধ করে। চরিত্রগুলির মধ্যে ঐ দুই বিরোধীশক্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া আজও আমাদের আকৃষ্ট করে। বস্তুতপক্ষে, সমাজ এবং ব্যক্তির বিরোধিতা এবং ব্যক্তির পরাজয় কি শুধু শরৎচন্দ্রের যুগেই সীমাবদ্ধ? আজও কি আমরা উপলব্ধির দিক দিয়ে সমাজের অনেক কিছুই না মানতে চাইলেও, চিরায়ত সংস্কারের কানে নতি-স্বীকার করি না? অথবা সমাজের 'পাঁচজনের একজন' হয়ে যা নির্বিচারে মেনে নিই, কেবল মাত্র 'পঞ্চম' হয়ে কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াই না? অথচ শেষপর্যন্ত সমাজকে আমাদের স্বীকার করেও নিতে হয়। মনে হয় বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ, দুদিক দিয়েই আমরা শরৎচন্দ্রের যুগ থেকে অনেক বিষয়ে এগিয়ে এলেও, আজও যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে আছেন, তার কারণ ঐ বিশেষ দিক দিয়ে তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের প্রাণের টান আজও ছিঁড়ে যায়নি।

হিন্দু নবজাগরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র

কমলকুমার ঘটক

ঊনিশ শতকের শেষ তিন দশকে বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা কেশবচন্দ্র সেন যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য সাধনায় মন দেন। তাঁর নূতন ধর্মমত নববিধান নামে পরিচিত হয় (১৮৮১)। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ভক্তি সাধনায় মন দেন (১৮৮৪-৮৫)। এ সবের ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং নব্য হিন্দুধর্মের উত্থানের সূচনা হয়। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি লাভ করে এক নবযুগের সূচনা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের ফল কারও অজানা নাই। ১৮৭৫-১৯০২ খৃষ্টাব্দকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগ বা নব্য হিন্দু ধর্মের যুগ বলাই সংগত।

বাংলা সাহিত্যে এই নব্য হিন্দু ধারার প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধিজীবী, সাধক নন। তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যায় যুক্তিবাদ এবং স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। বিনা বিচারে কোন মতবাদই তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু "তাঁর চিন্তাতে সে যুগের কঠোর জিজ্ঞাসাগুলির পূর্ণ মর্যাদা তিনি দিতে চেষ্টা করেছিলেন।"[১] ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাড়ীর একটি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পাদ্রী হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্টেটসম্যান পত্রিকায় কিছু বাদানুবাদ হয়। এই সময় হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত বঙ্কিমের Letters on Hinduism এরই ফল। আনন্দ মঠ এর পূর্বে এবং দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম-এর পরে প্রকাশিত হয়। 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত এই তিনটি ঔপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতের মূল সূত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তা তাঁর জীবনের শেষ দশকে (১৮৮৪-৯৪) পরিণতি লাভ করে। ১৮৮৪ থেকে বঙ্কিমের 'প্রচার' ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' প্রকাশিত হতে থাকে। এই দুটি পত্রিকায় বঙ্কিম ধর্ম সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করতে থাকেন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এবং গীতা ব্যাখ্যা শেষ দশ বৎসরে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম নিজেই লিখছেন, "সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন সাহিত্য থাকে যে তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃত রুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে ধর্ম ও যে সত্য, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্বের অংশ এই সাহিত্য সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"[২]

ধর্ম বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বা Religionকে বোঝাননি। তাঁর মতে যে নিত্য সত্য সমস্ত Religionএ আছে তাহাই ধর্ম। যে অবস্থায় মানুষের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয় তাহাই মনুষ্যত্ব, তাহাই মানুষের ধর্ম।

"The substance of Religion is culture, the fruit of it the higher life" দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে, Letters on Hinduism ও ধর্মতত্ত্বে এ কথা বঙ্কিম পরিষ্কার করেই বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের পক্ষে এই সর্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করা সম্ভব। মানুষের শক্তিগুলিকে বঙ্কিম বৃত্তি নাম

দিয়েছেন। এই বৃত্তিগুলিকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; শারীরিকী, জ্ঞানার্জণী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিণী। "এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।"[৩]

মনুষ্যত্বের চরম পরিণতির জন্য আদর্শ প্রয়োজন। বঙ্কিম মনে করতেন এই আদর্শ অদ্বৈতবাদীর 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বা হার্বার্ট স্পেনসারএর 'Inscrutable power in nature' এর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। "যিনি নির্গুণ তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না.....যাঁহাকে Impersonal God বলি তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে Personal God বলি তাঁহার উপাসনাই সফল।"[৪] উপনিষদের ধর্ম বঙ্কিমের মতে অসম্পূর্ণ ধর্ম, পৌরানিক হিন্দু ধর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সগুণ ঈশ্বর যেমন মানুষের আদর্শ হতে পারেন, যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায় তাঁরাও মনুষ্যত্বের আদর্শ হতে পারেন। যীশুখৃষ্ট খৃষ্টানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু হিন্দুর আদর্শ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তিনি সর্বদা লোকহিতে রত এবং ধর্ম রক্ষার জন্য যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব। হয়ত 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনায় বঙ্কিম নিজের মনোগত আদর্শ দ্বারা চালিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ বিস্ময়কর। মানবতার পূর্ণ বিকাশ এই কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজে পেয়েছেন।

পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় সমস্ত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন। সমস্ত বৃত্তিগুলির ঈশ্বরমুখীনতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি। তাহার ফল চিত্তশুদ্ধি। সমস্ত ধর্মের শেষ কথা চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের ফল ইহকালে সুখ এবং পরকালে সুখ। "মোক্ষ আর কিছুই নয় ঐশ্বরিক আদর্শনীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।"[৫]

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মের কথা বলেছেন তা মূলতঃ কর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে তিনি ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের অনুসন্ধানের ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা এই: "সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তীতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।"[৬] প্রশ্ন হতে পারে যে ত্রয়ী উপন্যাসে বঙ্কিম যে ধর্মের কথা বলেছেন ধর্মতত্ত্বের ধর্ম কি তার থেকে ভিন্ন? এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, যে ভক্তি বলতে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের ভক্তির কথা বোঝাননি। মধ্যযুগীয় ভক্তির মূলকথা নির্বিচারে ভগবৎ কৃপার কাছে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর প্রসাদলাভ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা পরিষ্কার কোরেই বলেছেন যে, "বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয় সমাবেশেই মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে।"[৭] ভক্তির এই সংজ্ঞা মেনে নিলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারায় কোন স্ববিরোধ আছে বলে মনে হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যার মূল সূত্রগুলি হিন্দু ধর্ম থেকে গৃহীত। এর মধ্যে নূতন কিছু নাই। কারণ হিন্দু ধর্মের মর্মভাগ অমর, মানবপ্রকৃতিতে তার ভিত্তি। বঙ্কিম এ কথা বিশ্বাস করতেন যে কালভেদে হিন্দুধর্মের বিধির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়েছে এবং হবেও। এই পরিবর্তনকে বঙ্কিম স্বাগত জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে শতাব্দীর প্রথমের ধর্মসভার নেতাদের সঙ্গে ও তাঁর সমসাময়িক শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ লক্ষণীয়। এঁরা প্রাচীন বিধিনিষেধের পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন যে, "হিন্দু ধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে, ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।" বিনা বিচারে ঋষি বাক্যসকল মস্তকে বহন করিলে "আমরা চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব। চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।"[৮]

হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। সে জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যাবে হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, ইতিহাসে, পুরাণে, প্রধানত

গীতায়। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু তার আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। বহির্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার দরকার। আনন্দমঠের উপসংহারে তাই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের কাছে বহির্বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্বেও এই বহির্বিষয়ক জ্ঞান Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology, Sociology পাশ্চাত্যের কাছে যাচ্ঞা করার কথা বলেছেন। কারণ "ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্ত বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্মপ্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"[৯]

হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য বঙ্কিম উপনিষদের ধর্ম পুনরুদ্ধারের কথা বলেননি। কারণ বেদ, উপনিষদ বা বুদ্ধের ধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণতা তিনি দেখতে পাননি। একমাত্র পৌরাণিক হিন্দুধর্মই জাতীয় ধর্ম হবার উপযুক্ত। বঙ্কিম বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে পরিবর্তন তাকে শুভ বলেছেন। কারণ এই পরিবর্তন হিন্দুধর্মকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার চেষ্টার ফলেই হয়েছে। হিন্দুর মন 'Barren and Intellectual' উপাসনায় তৃপ্তি পায়নি।[১০] কাজেই পূর্ববর্তী হিন্দুধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সকলের উপযুক্ত। কারণ এখানে "সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"[১১] এই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম স্বভাবতঃই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বঙ্কিম রামমোহন প্রদর্শিত পথে যাননি। বরং ধর্মের মূল সূত্র এবং সামাজিক বিধির পার্থক্য মনে রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা বিবেকানন্দের চিন্তার সমীপবর্তী। বিবেকানন্দের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "আমি বলি হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্মনাশের কোন প্রয়োজন নাই।.....ধর্মসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান উচিত তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।"[১২]

মূর্তিপূজা সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ মূর্তিপূজাকে পাপ বলে মনে করেননি। বরং তিনি ব্রাহ্ম সমালোচকদের সংযত হতে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মূর্তিপূজাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা মনে করেননি। তাঁর মতে যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়েছে, সর্বজনে প্রীতি হয়েছে তাঁর পক্ষে মূর্তিপূজার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে ততদিন বিষয়ী লোকের পক্ষে মূর্তিপূজা অবিহিত নহে; কেননা তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে।'[১৩] মূর্তিপূজার যে সমালোচনায় ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানেরা অভ্যস্ত তার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র হেষ্টিকে দিয়েছেন।[১৪]

"The existence of idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus . . . . . The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration, The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship."

জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক প্রথায় যে অবনতি এসেছিল বঙ্কিম তার পূর্ণ সংস্কার চেয়েছেন। কিন্তু জাতিভেদ হাস্যকর বা শোষণের যন্ত্র, বঙ্কিম এ কথা মানেননি। ব্রাহ্মণ এক সময় সমাজের শ্রেষ্ঠ ছিল নিজের যোগ্যতায়। সমাজ ব্রাহ্মণকে ভক্তি করত বলেই সমাজের উন্নতি হয়েছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় যে কোন ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা চলে না। বরং কেশব সেনের মত মহাত্মা যিনি সুব্রাহ্মণের গুণসকলে ভূষিত ছিলেন তিনি সকলের ভক্তির যোগ্য পাত্র। হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলি যদি সত্য হয় তাহলে সেগুলি পরিত্যাগ করলে লাভ হবে না। বরং সমাজকে সেই নীতি অনুযায়ী সংস্কার কোরতে হবে। বিবেকানন্দ প্রায় এক কথাই বলেছেন। "বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"[১৫] বঙ্কিম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগেই তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতের মৌলিকত্ব এবং কঠোর যুক্তিবাদ স্বীকার করে

নিলেও এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারায় শতাব্দীর শেষের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এককথায়, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার যুগের মানুষ নন। বরং তিনি হিন্দু মেলার ও রামকৃষ্ণ যুগের চিন্তাধারার কাছের মানুষ।

হিন্দু মেলার যুগ থেকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের যে প্রয়াস চলেছিল মূলতঃ বঙ্কিমের চিন্তা-ধারায় সে প্রয়াসের সমর্থন পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মকে তিনি সকল ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছেন। হিন্দুর সমস্ত জীবনই ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া ধর্ম। কাজেই অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমের বিচারে শাক্যসিংহ বা যীশুখৃষ্ট হিন্দুর আদর্শ অবতার শ্রীকৃষ্ণের আসন কখনই পাননি। Letters on Hinduismএ তাঁর একটি উক্তি লক্ষণীয়।[১৬]

"If it (pure monotheism) is found at all it will be found is spheres of lower culture, among Mohamedans for instance."

কাজেই অন্য ধর্মের চেয়ে হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহ। উপন্যাসগুলিতে সাধারণতঃ তিনি মুসলমান শাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আনন্দমঠ ও সীতারামে মুসলমান শাসন ধ্বংস ও হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টাকে বঙ্কিমের আদর্শ বললে বোধহয় ভুল হবে না। মুসলমান চরিত্রের কঠোর সমালোচনা তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেছেন যে বঙ্কিম অত্যাচারী মুসলমানের সমালোচনা করেছেন, সাধারণ মুসলমানের নয়।[১৭] একাধিক লেখক এই ধরনের মতের সমর্থনে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধ থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। সাধারণভাবে বঙ্কিম মুসলমান সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতির চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করেছেন। মুসলমান চরিত্রের সাধারণ সমালোচনাও বঙ্কিম সাহিত্যে বিরল নয়। "ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পালায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পালায়, শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়। ধর, ইংরেজদের জিদ্ আছে, যা ধরে তা করে মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তারপর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায়-বই দশ জায়গায় পড়বে না। সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশজন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলেও একটা ইংরেজ পলায় না।"[১৮] (মহেন্দ্রের প্রতি ভবানন্দের উক্তি—আনন্দমঠ) বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলমানের প্রতি কঠোর মনোভাব আছে, এ কথা মেনে নিয়েও বঙ্কিমের চিন্তার মূল্যায়ন সম্ভব। প্রথমতঃ বঙ্কিম যে যুগে লিখছেন সে যুগের প্রথম থেকেই সকলে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। রামমোহনও এর ব্যতিক্রম নন। দ্বিতীয়তঃ অষ্টাদশ শতকের মুসলমান শাসনের স্মৃতি ঊনিশ শতকের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই পীড়িত করেছিল। কাজেই বঙ্কিম যখন বলছেন "আজ নিয়মের দিন, তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর"[১৯] তখন তিনি একটা যুগের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবাদ বলতে ঊনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদই বোঝা যেত। রাজনারায়ণ বসু স্বদেশী যুগে Grand father of nationalism নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনিই 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতা দিয়ে হিন্দু নবজাগরণের চেষ্টাকে সাহায্য করেন (১৮৭১)। অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা বৈদান্তিক ধর্মকেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুধর্ম প্রচারের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। তাঁর মুসলমানের প্রতি কঠোর মনোভাবের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে বঙ্কিম কি মুসলমান রাজ্য ধ্বংসের পরও মুসলমানের ধ্বংস চেয়েছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মে ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। "এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই।"[২০] বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মে কোনও সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি বিদ্বেষের কথা নাই। কাজেই হিন্দু নবজীবন পাওয়ার পর হিংসায় লিপ্ত হবে না। দেশপ্রীতি

ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও সামঞ্জস্য হলেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম' ঊনিশ শতকের স্বাধীনতার মন্ত্র হিসাবে স্বীকৃত। স্বাদেশিকতার সঙ্গে জগৎপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। বরং জাগতিক প্রীতিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতা। কাজেই সঙ্গতভাবেই বলা যায় :

"Patriotism was not and could never become the religion of the author of Dharamatattva and was only but a means, albeit essential, to the end which was Jagatiki Priti, love for the whole of creation." [২১]

বঙ্কিম মুসলমানের সমালোচনা করে ঊনিশ শতকের সাধারণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরে ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির কথা বলে তিনি ঊনিশ শতকের ভাবধারাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। তাঁর কল্পনার আদর্শ হিন্দুরাজ্যে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নাই, আছে সর্বভূতে প্রীতি আর ঈশ্বরে ভক্তি।

ঊনিশ শতকের চতুর্থভাগে যে হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন হয় তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল? এই প্রশ্নের বিচারে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে হিন্দু যুবকদের মধ্যে তিনরকম মনোভাব দেখা দেয়। একদল যুবক সরাসরি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দল যাঁদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, ডিরোজিও পন্থী, স্বাধীন চিন্তাধারার সমর্থক। তৃতীয় দল, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেন। দ্বিতীয়তঃ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতারা এই তিনটি ধারারই বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করতে পারেননি। তৃতীয়তঃ এই চারটি ধারাই অল্পাধিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শতাব্দীর প্রথমে প্রত্যেকটিকেই কলিকাতার নব নাগরিক সংস্কার বলা যেতে পারে। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে কোন আন্দোলনই সারা দেশে পরিব্যপ্ত হয়নি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবকদল হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ মতবাদ ও জীবনের আদর্শ তাঁরা অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে তাঁরা উচ্ছৃংখল ও অনাচারী হয়ে পড়েন। নব্যশিক্ষিত এই যুবকদের বর্ণনা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

"He has a smattering of English . . . . . is ultra fashionable in dress and unceremoniously drags poor Shakespeare and Milton from their repose and misquotes the most familiar passages . . . . . sensual delights are the godesses of his idolatry. He eats beef, cracks a whole battle of Cognac at Spence's or Wilson's".

শতাব্দীর প্রথমের এই যুবকদলের সামনে হিন্দু সমাজের নেতারা কোন আদর্শ দিতে পারেননি। কেবল কঠোর দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শতাব্দীর শেষে নব্য হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত লোকের সামনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছে। উপরন্তু হিন্দুধর্মের পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করছে। স্বভাবতই শিক্ষিত হিন্দু একে উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং নিজ ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ফিরে এসেছে। 'প্রচার' এবং 'নবজীবনে' হিন্দুধর্মের আলোচনা দেখলে বোঝা যাবে যে হিন্দু সমাজের শতাব্দীর প্রথমের শংকা কুণ্ঠার ভাব কেটে গিয়েছে। লেখকরা যে ধর্মের কথা বলছেন তা বিবেকানন্দ যুগের Aggressive Hinduism-এর পূর্বাভাষ। বঙ্কিমের চিন্তা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধারা থেকে ভিন্ন। কিন্তু বঙ্কিমের যুক্তিবাদ ধর্ম আন্দোলনের এই ধারার পূর্ণ পরিণতিকে সহায়তাই করেছে, কোন প্রকারে দুর্বল করেনি।

ব্রাহ্ম সমাজের আভ্যন্তরীণ বিপদের সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় (১৮৭২)। নব্য যুবক সম্প্রদায় বঙ্গদর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। বঙ্কিমের লেখা যুবকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, সমসাময়িক ইতিহাসে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[২৩]

"The Tattvabodhini was a bit too serious and learned for our youthful minds, while the Bangadarshan with its fictions and poetry and satire as well as historical and social essays appealed more powerfully to us. Bankimchandra rose in our estimation as Sir Walter Scott of Bengal."

যুবকরা একদিকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অন্য দিকে বঙ্কিমের রচনায় তাঁদের স্বজাতি প্রীতি ও দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস আলোচনা করে বঙ্কিম আমাদের জাতীয় দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই আলোচনা হিন্দুধর্ম আলোচনার পরিপূরক। বঙ্কিমের মতে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা ইংরেজের কাছে পেয়েছি। ধর্মতত্ত্বে স্বদেশপ্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র সকল ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু দেশপ্রীতির ও সার্ব-লৌকিক প্রীতির সামঞ্জস্যের উপদেশ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবলমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচারক মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ স্বদেশপ্রীতি এবং জাগতিক প্রীতিতে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, বঙ্কিমের রচনায় এ রকম ইংগিতই পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম সমাজের উদার ভাবধারাকে বঙ্কিম প্রতিহত করেছিলেন এ রকম সমালোচনা কোন কোন ঐতিহাসিক করেছেন।[২৪] বঙ্কিমের রচনাতেই এ সমালোচনার উত্তর পাওয়া যাবে। "হিন্দুর ঈশ্বর সর্বভূতময়।.....তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল-বাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে : অচ্ছেদ্য অভিন্ন জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই।"[২৫]

১। ভবতোষ দত্ত, **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** (কলিকাতা ১৯৬১) পৃঃ ৪৭

২। সাহিত্য সংসদ, **বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড** (কলিকাতা ১৯৬১) পৃঃ ২৪৭

৩। **ধর্মতত্ত্ব ৫ম অধ্যায়। অনুশীলন** পৃঃ ৫৯৫ (বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড)

৪। **ধর্মতত্ত্ব ৪র্থ অধ্যায়। মনুষ্যত্ব কি?** পৃঃ ৫৯৩

৫। **ধর্মতত্ত্ব ৪র্থ অধ্যায়। মনুষ্যত্ব কি?** পৃঃ ৫৯৩

৬। **ধর্মতত্ত্ব একাদশ অধ্যায়। ঈশ্বরে ভক্তি** পৃঃ ৬২২

৭। **ধর্মতত্ত্ব একাদশ অধ্যায়। ঈশ্বরে ভক্তি** পৃঃ ৬২১

৮। **ধর্মতত্ত্ব ২৪ অধ্যায়। স্বদেশ প্রীতি।** পৃঃ ৬৬৮, ৬৬৫

৯। **আনন্দমঠ** (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৪) পৃঃ ১১৭

১০। *English Writings of Bankimchandra* (Bangiya Sahitya Parishad 1940) পৃঃ ৫৪

১১। **ধর্মতত্ত্ব ২৪ অধ্যায়। স্বদেশ প্রীতি।** পৃঃ৬৬৮

১২। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, **স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী** (কলিকাতা ১৯২৭) পৃঃ ১৫৫

১৩। **ধর্মতত্ত্ব বিংশতি অধ্যায়। ভক্তি।** পৃঃ ৬৪৭

১৪। *English Writings of Bankimchandra* পৃঃ ১০৫

১৫। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, **স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী** (কলিকাতা ১৯২৭) পৃঃ ১৫৪

১৬। *English Writings of Bankimchandra* পৃঃ ৪৫

১৭। *Amales Tripathi, The Extremist Challenge* (Cal. 1967) পৃঃ ১৭

১৮। **আনন্দমঠ** (পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৪) পৃঃ ২৪

১৯। **আনন্দমঠ** (পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৪) পৃঃ ৩৬

২০। **ধর্মতত্ত্ব ২৪ অধ্যায়। স্বদেশ প্রীতি** পৃঃ ৬৬১

২১। *Amales Tripathi, op. cit.,* পৃঃ ১৭

২২। David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance* (Cal. 1969) পৃঃ ২৫৮

২৩। B. C. Pal, *Memories of my life and times* Vol. I (Cal. 1932) পৃঃ ২২৮

২৪। C. H. Heimsath, *Indian nationalism and Hindu Social Reform* (Princeton 1964) পৃঃ ২৭৪

২৫। **ধর্মতত্ত্ব একবিংশতি অধ্যায়। প্রীতি** পৃঃ ৬৪৯

প্রাজ্ঞতা

বার্ণিক রায়

হে জীবন, কাকে বলো তোমার প্রাজ্ঞতা!

আমাদের প্রাজ্ঞতার অন্ধকারে পাপের গোপন
অপরাধ নিরোধের মতো জ্বলে ওঠে
জলময় জীবনের বিষণ্ন বিষাদে।

মানুষের জীবনে প্রাজ্ঞতা শুধুই বাতুলতা—
শীতময় গাছের বাকলে মেঘের চঞ্চল কান্না
উড়ে যায় দিন শেষে রাতের ব্যথায়;
পাহাড়ের বুক জুড়ে জলের আগুন-তৃষ্ণা
হয়তো কখনো নেভে শাদা বরফের
নিয়তির চাপে, তারপর একদিন দেখি
বুকের পাঁজরে, সারা ফুস্‌ফুসে কালো ক্ষয় রোগ,
ফাঁপ্‌রা-করা অসীম শূন্যতা
ছাই হয়ে মিশে যায় আকাশের গায়

মৃত্যুই প্রাজ্ঞতা :
একালে আমরা তাই সকলেই প্রাজ্ঞ!

৪ঠা মার্চ, ১৯৬৯।

জিষ্ণু দে

বিজ্ঞানের জগতে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌স্টিট্যুট অফ টেক্‌নোলজি বা এম আই টি সুপরিচিত। বিজ্ঞান-কেন্দ্রীক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদ, রসায়নবিদ ও প্রাণীবিদ অধ্যাপক ও ছাত্রদের কর্মময় জীবন সুবিখ্যাত। আমেরিকার শিক্ষিততম অঞ্চল বস্টন এলাকায় এই ইনস্টিট্যুট ও পাশের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

১৯৬৯ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ এই

ইনস্টিট্যুটে একটি বন্ধ্ বা স্ট্রাইক সংঘটিত হয়। ঘটনাটি আমেরিকার ইদানীং শিক্ষাজগতে একেবারে নতুন না। তা হলেও এম আই টি প্রেসের "৪ঠা মার্চ" বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে সাধারণ সমস্যারই একটি পূর্ণ রূপ চোখে পড়ে।

আন্দোলনের ইতিহাস

পদার্থবিজ্ঞানীদের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের সাধারণ এক অনুযোগ হচ্ছে তাঁদের সমাজচিন্তার তুচ্ছতা। উদাহরণস্বরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় শিক্ষা বা পরীক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে তাঁরা নানা "বৈজ্ঞানিক" শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম অনেক-সময়ই বৈজ্ঞানিক নয়।—সমাজব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ একটা পরিবর্তনের কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাবা চলে নিশ্চয়ই। কিন্তু আলাদা করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক করা যায় না—বিজ্ঞান শিক্ষাকেও নয়। এমনকি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাও বিজ্ঞানের নিয়ম অগ্রাহ্য করে সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন[১]। এবং যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী স্থিতাবস্থা (বা অগ্রগতি) পশ্চাদ-গতির মতই সম্ভাব্য,[২] সেহেতু অনেক সময়েই দেখা যায় বিজ্ঞান পেছু হাঁটছে বা গাড্ডায় পড়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানীদের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের অনুযোগের চরম উদাহরণ, ফরাসী দার্শনিক এলুলের আইনস্টাইন বা ওপেনহাইমার বিষয়ে মন্তব্য। তিনি বলেছেন, "আইনস্টাইন, এমনকি অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতিপ্রিয় ওপেন্‌হাইমার নিজেদের বিষয়ের বাইরে গেলেই মামুলী তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন না।" (জাক্ এলুল; "টেক্‌নলজি-কাল সোসাইটী", ভিণ্টেজ্ পেপারব্যাক্)। বিষয়টির একটি উদাহরণ আমরা পাবো। ওপেন্‌-হাইমার হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসের কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, "আমেরিকান সরকার যাঁরা চালান তাঁরা বিচক্ষণ। তাঁদের হাতে এটম বোমা তুলে দিলে অপব্যবহার হবে, ভাবা ঠিক নয়!"

এম আই টির রিসার্চ স্ট্রাইকের গোড়াপত্তন কিন্তু এক পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, ফিগেনবাম্ এর বাড়ীতেই। ফিগেনবাম্ ও আরো দুটি ছাত্র কুর্ট্ গট্‌ফ্রিড্ (তখন ভিজিটিং প্রফেসর) ও পরে অধ্যাপক ডেভিড ফ্রিশ্ ও বার্নাড্ ফেল্ড্ এর সঙ্গে আলোচনা করেন। এরা তিনজনেই পদার্থবিজ্ঞানী। পদার্থবিদ্যা বিভাগের বাইরে প্রথম উৎসাহ দেন প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র কাবাৎ, ও অধ্যাপক সালভাদর লুরিয়া, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লুরিয়া। চমস্কি অবশ্যই এই পর্যায়ের খসড়া প্রস্তাবে রাজী হন। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হানস্ বেটেকে আমন্ত্রণ জানালে, পদার্থবিজ্ঞানের এই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একদিন বক্তৃতা দিতে রাজী হন। প্রস্তাব হয় ৪ঠা মার্চ রিসার্চ বন্ধ। ফেল্ড্, ফেশ্‌বাখ্ ভাইস্‌কফ্ ও ফ্রান্সিস লো (পদার্থবিদ্) মেসেলসন (হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিজ্ঞানী) স্নোলিং (হাভার্ড অর্থনীতিক) ইত্যাদি অনেকে সোৎসাহে সাংগঠনিক কাজে তাঁদের অমূল্য সময় দিতে রাজী হন।

এম আই টির প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক হাওআর্ড জনস্‌ন্ ও প্রভস্ট্ জেরোম্ ভিস্‌নার (ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীআরিং এর অধ্যাপক ও জন কেনেডীর বিজ্ঞান উপদেষ্টা) ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে খোলাখুলি সম্পর্ক রাখেন ও প্রগতিশীল। তাই, তাঁদের রিসার্চ স্ট্রাইকের প্ল্যান জানানো হয়। ভিস্‌নার অস্ত্রসম্বরণ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তা হিসাবে, স্বাভাবিকভাবেই, প্রস্তাব করেন ঐ স্ট্রাইকের দিনে, এই সব ব্যাপারে আলোচনা করা হোক। সরাসরি স্ট্রাইকের বিরোধিতা তাঁরা করেননি।

---

(১) এ বিষয়ে সম্প্রতি বহু কাজ হয়েছে তবে টমাস কুনের "স্ট্রাক্‌চার অফ সায়েণ্টিফিক্ রেভোল্যুশন" (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় : পেপারব্যাক্) বইটিতে সংক্ষেপে অনেক মূল্যবান কথা বলা আছে।

(২) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ে সাধারণ পাঠ্য নানা সস্তা পেপারব্যাক বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে আমার মত সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির ভালো লাগতে পারে মাইকেল স্টুয়ার্টের "কেন্‌স্ এণ্ড আফ্‌টার।" সমাজ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত বই রোজ দম্পতির "সায়েন্স এণ্ড সোসাইটী।" দুটিই পেলিকান পেপারব্যাক।

১৯শে ডিসেম্বর, হার্মান ফেশ্‌বাখের সভাপতিত্বে, প্রথম মীটিং বসে। ইতিমধ্যে ছাত্র ও দু-একজন অধ্যাপক সায়েন্স এ্যাক্‌শন কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সংক্ষেপে সাক্‌) বলে একটি সংঘ গঠন করেছেন। ফিগেনবাম প্রথমেই প্রস্তাব করেছিলেন, অধ্যাপকরা সাকের মত আরেকটি কিন্তু আলাদা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী গড়ে তুলুন। এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু, শেষ অবধি, ছাত্র ও শিক্ষকদের একত্রে কাজ করার চেষ্টা বিফল হয় এবং এরকম একটা ভিন্ন সংঘ, উক্‌স্‌—"ইউনিয়ন অফ কনসার্ন্‌ড্‌ সায়েন্টিস্টস্‌" গড়ে ওঠে।

ছাত্ররা স্বভাবতই শিক্ষকদের চেয়ে বেশী প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে বেশী অভিজ্ঞ। তাছাড়া শিক্ষকরা, এম আই টিকে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও আমেরিকার সম্পদের অপব্যবহার-এর মতো স্নায়ু-উত্তেজক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করতে ছাত্রদের চেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছিলেন। জানুয়ারীতে নিক্সনের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, লী দুব্রিজের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো নিয়ে এই সংঘর্ষ প্রথম ঘটে। তারপর "সায়েন্স" ম্যাগাজিনে জানুআরীর শেষে, "বিজ্ঞানীরা ৪ঠা মার্চ এম আই-টিতে রিসার্চ বন্ধ করতে চান" এই শীর্ষক প্রবন্ধ বেরোয়। এর পর ২৪শে জানুআরী "বস্টন গ্লোব" পত্রিকা ফিগেন্‌বাম্‌ ও আরেকজন ছাত্রকে ইণ্টার-ভিউ করে ও ছাত্র-শিক্ষক একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে। সেদিন সকাল থেকেই ডঃ ফেশ্‌বাখের টেলিফোনে অজস্র 'কল' আসতে থাকে। অনেক শিক্ষকই মনে করেন, তাঁদের বক্তব্য অতিরঞ্জিত হয়েছে। এর পরই সাক্‌ ও উক্‌স্‌ ভাগ হয়ে যায়। তারপর থেকে মার্চ পর্যন্ত আর কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। উক্‌স্‌ প্রস্তাবে ৫টি ধারা রাখা হয়।

(১) বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি যেখানেই জড়িত সেখানেই নীতির সমালোচনামূলক বিচার; (২) যুদ্ধসংক্রান্ত টেক্‌নলজি থেকে রিসার্চকে সরিয়ে নিয়ে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের সমস্যাসমাধানে নিয়োগের পথ খোঁজা: (৩) ছাত্রদের কাছে এই আশা প্রকাশ যে, তারা মানবকল্যাণের কাজে নিযুক্ত হবে এবং কোন বিনাশকারী অস্ত্র সংক্রান্ত কাজ নেবার আগে তার ফলাফল বিচার করে দেখবে; (৪) দৃঢ়ভাবে এ বি এম (এই প্রবন্ধে বরাবর এ বি এম-এর অর্থ অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল), নিউক্লিঅর অস্ত্র ও কেমিকাল ও বাইওলজিকাল যুদ্ধসামগ্রীর বিরুদ্ধে মতপ্রচার; (৫) বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীআরদের সমাজকল্যাণের জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ করার সম্ভাবনা খোঁজা। এই প্রস্তাবে, আগে নাম করা বিজ্ঞানীরা ছাড়াও, ব্রুনো রসি, আরভিও কাপ্‌লান্‌, স্টীভেন ভীনবার্গ, ফিলিপ মর্স, (পদার্থবিদ), ডেভিড শুমেকার, আর্ভিং ওপেনহাইম (রয়াসনবিদ), এলিয়ট লীব, কেনেথ হফ্‌ম্যান, ওয়ারেন এমব্রোজ (অঙ্কবিদ্‌), ফ্রাঙ্কো মোদিলিয়ানী, জেরোম রোথেনবার্গ (অর্থ-নীতিক) ইত্যাদি অনেকে নাম দেন।

আলোচনা : প্রথম সভা।

ফিগেনবাম, ছাত্রসুলভভাবে, সভার প্রথম বক্তৃতা পেশ করেন। তিনি বলেন, চার মাস তাঁর থিসিসের কাজ বন্ধ, সংগঠনের কাজে। এবং এই কাজে সব সময় একটা বিষাদ তাঁকে আচ্ছন্ন রেখেছে। বিষাদের কারণ, কেন আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠায়নি, এবং কেন শিক্ষিত সম্প্রদায় আরো প্রতিবাদে মুখর হয়নি। একটি খুব সাধারণ ভিয়েতনামী ঘটনা তিনি উদ্ধৃত করেন—এক আমেরিকান সৈন্যর রিপোর্ট "অনেক হাত-পা ছড়িয়ে ছিল, কিন্তু জলাজমির মধ্যে সমস্ত গোনা সম্ভব হয়নি। ছটি মাত্র আস্ত ভিয়েতকং দেহ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু অন্ততঃ আরো ষাটজন শত্রু আমরা মেরেছি।"

চমস্ককে, অনেকে বলেন, ভাষাতত্ত্বের আইনস্টাইন। সিম্‌বলিকাল লজিক ও অঙ্কভিত্তিক তাঁর থিওরী কিন্তু নানা সামাজিক প্রয়োজনে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। চমস্কির থিওরী অনুযায়ী ভাষার সাধারণ ব্যবহার এর সঙ্গে মুক্ত মনের অবিচ্ছেদ্য যোগ। ফলে মুক্তিহানি মানে ভাষাহীনতা!

চমস্কির বক্তৃতায়, স্বাভাবিকভাবেই, নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে পড়ে। ১৯৫৯ সালে ফরাসী-

দের ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় স্টেট ডিপার্টমেণ্ট নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছিল : কমিউনিজমের ঘাঁটিকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করা দরকার। কিন্তু ১৯৬৯এ তারাই হঠাৎ নিঃস্বার্থভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামীর স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, চমস্কি বিশ্বাস করতে চান না। ম্যাকনামারা সম্বন্ধে চমস্কি বলেন : এই সেই লোক, যে চরম দক্ষতার সঙ্গে তাই করে দেখায়, যা কখনো করাই উচিত নয়। "ম্যানেজমেণ্টের হাতেই ক্ষমতা দিতে হবে, কারণ শেষ অবধি তারাই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—যেহেতু তাদের মালমশলা ভগবানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, অর্থাৎ মানুষ।" বলেছেন ম্যাকনামারা : "ভগবান গণতান্ত্রিক। বুদ্ধি তিনি সমানভাবেই বিলিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন তা দিয়ে আমরা সৃষ্টি করব—এবং এই সম্পদসৃজন করানোই হল ম্যানেজমেণ্টের কাজ।" এই একই ভগবানের বিধানেই নিশ্চয় এক সমন্বিত পৃথিবীর অর্থনীতি গ্রথিত করতে হবে, যার মূল মালমশলা আন্তর্জাতিক করপোরেশন। "নিশ্চিত-ভাবেই নতুন এবং আমেরিকান সৃষ্টি" বলেছেন জর্জ বল : "এই ধরনের করপোরেশন করেই পৃথিবীর সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু, পৃথিবীর অর্থনীতির আরো সমন্বিত রূপ না হলে, এই করপোরেশনগুলো পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করতে পারবে না।" এবং চমস্কি বলেছেন : তাহলে এই নিশ্চিত "আমেরিকান সৃষ্টি"র পুরো ফলাফলও "স্রষ্টারা" পাবেন না!

এ বি এম-এর পেছনেও চমস্কি দেখেন অর্থ-নৈতিক লাভ। ২৮টি প্রাইভেট কনট্রাক্টর, ৪২টি প্রদেশে, ১৮২টি কংগ্রেস জেলায় ছড়ানো। তাছাড়া এ বি এম গেলেও আবার অন্য কোন হুজুগ আসবে, যতক্ষণ না জাতীয় প্রয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব-সূচীর পরিবর্তন আসে।

চমস্কির পর আসেন এক মজার বক্তা, যিনি সগর্বে নিজের পরিচয় দেন জেনারেল ওয়েস্টমোর-ল্যাণ্ড, ও পরে এ্যাব্রাম্‌স্‌এর উপদেষ্টা ও সরকারী যুদ্ধযন্ত্রের নানাগলিতে ভ্রমণকারী হিসাবে। নাম উইলিঅম ম্যাকমিলান। ইউনিভার্সিটী অফ ক্যালি-ফোর্ণিয়া (লস এঞ্জেলস্‌) থেকে ইনি আসেন—বিজ্ঞানীদের, ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে, সরকারকে আরো সক্রিয় সাহায্য করা উচিত—এই কথা জানাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিজ্ঞানীরা যেরকম যুদ্ধের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, সেরকম হলে ভিয়েতকংরা অনেকদিন আগে হেরে যেতেন, ম্যাকমিলান মনে করেন। এবং সেক্ষেত্রে দুপক্ষেরই মানুষ মারা যেত কম! "মানবিক কারণেই যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য" তিনি আহ্বান করেন এ যুগের বুশ, কনাণ্ট, ইউরে, ফের্মি, ওপেনহাইমার, দুব্রিজদের এগিয়ে আসতে। "খবরের কাগজের ভিয়েতনাম যুদ্ধের একপেশে চেহারার প্রকাশকে অগ্রাহ্য করে, ভিয়েতকংদের দমন করার জন্য আমেরিকান সরকারের হাত শক্ত করতে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসুক। ছেলেভুলানো ছেড়ে আমাদের বোঝা উচিত পশ্চিমের ভেড়া ও কমিউনিস্ট চিতাবাঘ আজ যুদ্ধে লিপ্ত এবং চিতা তাঁর গায়ের দাগ পাল্টাচ্ছে না সহসা।" আরো অনেক বিষয়ে ম্যাকমিলান সাহেব অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। তার মধ্যে, রসায়নবিদ্‌ হিসাবে, রাসায়নিক গ্যাস যুদ্ধে ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, খুবই প্রণিধানযোগ্য। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে আকারণেই প্রতিবাদে মুখর। কারণ তিনি দেখাচ্ছেন, এই সব গ্যাস, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য আঘাতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, যুদ্ধে উভয় দিকের মানুষেরই প্রাণহানির আশঙ্কা কমিয়ে দিচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন সর্বদেশে পুলিশ ব্যবহৃত গ্যাস-এর মতোই নিরীহ গ্যাস সি এস আমেরিকা ভিয়েতনামে ব্যবহার করে। বর্ণাল পীস লাইব্রেরী (লণ্ডন) ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ইণ্টারন্যশানাল ওআর ক্রাইমস্‌ ট্রিব্যুনাল-এর দৌলতে অবশ্য এসম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশিত।[৩]

(৩) স্টীভেন রোজ সম্পাদিত "কেমিক্যাল ও বাওলজি-কাল ওয়ারফেরার" বইটিতে এবিষয়ে বহু তথ্য আছে। Faculté de Médecine de Paris এর প্রফেসর, এম এফ কাহ্‌ন, রাসেল কমিশনের হয়ে ভিয়েতনামে যান। তিনি দেখেন সি এস ঘন অবস্থায় ভিয়েতকং—আশ্রয়স্থল ছোট্ট গুহা বা কুঁড়েঘরে কুড়ি বাইশ পাউণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার মত বোমা আমেরিকা ব্যবহার করে। কাহ্‌ন ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা দেখেন ২০০ থেকে ২৫০০ মিলিগ্রাম/(মিটার) সি এস দিলে দশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু ইঁদুরের দু তৃতীয়াংশ মরে যায়। এ থেকেই এই নির্দোষ টিয়ার গ্যাসের ক্ষমতা অনুমেয়। বইটিতে বলাই বাহুল্য, আরো অনেক তথ্য আছে যা উৎসাহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

কালে সর্বদেশে তা প্রণিধানযোগ্য। "আমাদের নতুন সরকার প্রজাদের অনুমতি নিয়ে গঠিত অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক। তাই, শুধু শক্তিই যথেষ্ট নয়। চাই ঠকানো (deception)। যখনই কোন সরকার প্রজাদের ভালোভাবে ঠকাতে শেখে, তখনই আমরা তাকে রাজনীতিতে আধুনিক বলি।" এই অর্থেই শিক্ষাজগতের ক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে। অ্যারিস্টটলীয় (বা ভারতীয়) ধ্যানের অর্থে নয়, বেকনিয়ান পরিবর্তনের অস্ত্র হিসাবে জ্ঞানকে ব্যবহার করলে তা এই ঠকানোর বিরোধী হয়ে ওঠে। শিক্ষাজগতের এই ক্ষমতা, ৎসিন্ মনে করেন, এতদিন আমরা নষ্ট করেছি। "কিন্তু আর তা আমরা করতে পারি না। আমাদের বলতে হবে আমরা প্রথমে মানুষ, মানুষের ভবিষ্যতে উৎসাহী। তারপর আমরা বিদ্যোৎসাহী, এ্যাকাডেমিক। এক ঘণ্টার মধ্যে, পক্ষপাতহীন বিদ্যাচর্চার স্বপক্ষে, তিনটি লেখা চোখে পড়ে তাঁর। (১) ওআল্টার লিপম্যান, নিউ রিপাব্লিকে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধে; (২) ড্যানিয়েল বেলের এক প্রবন্ধে; (৩) রিচার্ড হফ্স্টাটার-এর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক বক্তৃতায়। কিন্তু, যখন সমাজে সকলেই নিজের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি অনুযায়ী ছুটেছে, তখন সেই সমাজেরই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু বুদ্ধিমান সৎ লোকজন, উদ্দেশ্য-বিহীন বিদ্যাচর্চা নিয়ে পড়ে থাকলে তার বিপদ অনিবার্য। আমাদের ক্ষমতা, সত্যকে খুলে ধরবার ক্ষমতা। আমাদের দেশে, এই বিরাট অশুভ সময়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের পথ বেছে নিতে হবে। টাকার জন্য বুদ্ধি ও জ্ঞান আমরা নিলামে চড়াতে পারি, আমরা তা নষ্টও করতে পারি। কিন্তু সরকার পছন্দ করে না, এভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারি, তাতে সরকারের দমনের সম্ভবনা জেনেও, যাতে করে সমাজকে পাল্টে দেওয়া যেতে পারে।"

ৎসিনের পর রাবিনোভিচ্ (পদার্থবিদ্যা) বলেন, সভাপতি লুরিয়া ছাড়া তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী বক্তা। এবং সভাপতি কিছু বলবেন না জানিয়েছেন, খুব বিচক্ষণভাবেই। এবং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব দেখেছেন, নাৎসী শাসনে জার্মানীতে থেকেছেন, ইংলণ্ডে পাঁচ ও আমেরিকায় বহু বছর থেকেছেন। সার্বিক আন্তর্জাতিকতা থেকে বিপ্লবের সংকীর্ণতম জাতীয়তাবাদী হওয়ার রূপ তিনি দেখেছেন রাশিয়ায়, ও কম ঘনিষ্ঠভাবে, চীনে। এবং আমেরিকা আগের চেয়ে বেশি করে সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) হচ্ছে, এও তিনি অনুভব করছেন। যদিও তিনি এখনো এই সরকারকেই নিজের পক্ষে শ্রেয়ঃ বোধ করছেন, তবু ভবিষ্যতের পক্ষে এ যথেষ্ট ভালো নয়। অধ্যাপক রাবিনোভিচ্ "এই সরকার ঐ সরকার, এই অর্থ-নীতি ঐ অর্থনীতি" : এই সহজ হিসাবে স্বভাবতঃই বিশ্বাস করেন না। উসুসী নদীর দুপাশে চীন-রাশিয়া রণসজ্জায়। এবং আমেরিকার কংগ্রেস নোংরা জঘন্য, এ ভেবেও লাভ নেই। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানীদের এখনো একটা ভূমিকা রয়েছে—আন্তর্জাতিক ভূমিকা। আর ঠিক এইরকম এক ভূমিকা রয়েছে আজকের তরুণ সমাজের। এঁদের নতুন চিন্তাধারা attitude গড়ে উঠ্ছে। তার পরে গড়ে উঠবে নতুন সংগঠন Institution কারণ চিন্তাধারা না হলে সংগঠন হয় না।

এর পর ওঠেন আমেরিকার নতুন বামসংঘ, এস্ ডি এস্, এর এরিক্ মান্। এপর্যন্ত আলোচনায় ছিল এম আই টি, কংগ্রেস, ভিয়েতনাম এমনকি চীন, রাশিয়া। মান্ই প্রথম উঠে বলেন তৃতীয় জগতের কথা। দুর্দশাগ্রস্ত সেই এশিয়া ও আফ্রিকার নির্বাক মানুষদের কথা, যারা সত্যি আণবিক যুদ্ধের ভয়ে ভীত নয়। কারণ, এক হিসাবে, তাদের দৈনিক জীবনই আণবিক যুদ্ধের মত ভয়াবহ।

মান্ আন্তর্জাতিক চিন্তার স্বাধীনতার (academic freedom) ধারণাকেও আঘাত করেন। বস্টনের শ্রমিকদের হয়ে, তাঁর ইচ্ছা করে, ম্যানেজ-মেণ্ট ক্লাশে ঢুকে বলতে, এই শিক্ষার আসল অর্থ কী। মানেজমেণ্ট শিক্ষা : যা মানুষকে ও যন্ত্রকে একই হিসাবে ফেলে কাজ করে। এই শিক্ষাদানের স্বাধীনতা, বা এমনকি ভিয়েতনামীদের মারবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বাধীনতার তুলনায় মানুষকে হত্যা করার স্বাধীনতা, যা সরকারের রয়েছে, তা অনেক বেশী ভয়াবহ সন্দেহ নেই। তাছাড়া পেণ্টা-গণই তো সমস্ত অপরাধের দায়ভাগী নয়—ঠাণ্ডা

ম্যাকমিলানের পর পদার্থবিদ ভিক্টর ভাইস্‌-কফ্‌ বিজ্ঞানের পশ্চাদগতির সম্ভাবনা ইঙ্গিত করেন, তবে উইনস্টন চার্চিলকে উদ্ধৃত করে। তাঁর মতে বিজ্ঞানের সুব্যবহার করা ও অপব্যবহার বন্ধ করা দুভাবে করা চলে। ভেতর থেকে ও বাইরে থেকে। শেষ অবধি বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

রোনাল্ড প্রোব্‌স্টাইন্‌ এম আই টির মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অধ্যাপক। তিনি তাঁর ফ্লুইড মেকানিক্স-এর জ্ঞান ব্যবহার করছেন পলিউশন ও ডিস্যালিনেশন সংক্রান্ত রিসার্চ-এ। তাঁর বক্তৃতায় জানা যায়, অন্যান্য অধ্যাপকরাও এইরকম সমাজ-বিষয়ক রিসার্চে চলে আসছেন। উদাহরণ : প্রফেসর জেম্‌স্‌ কেক্‌ (এটম বোমা ও ব্যালিস্টিক মিসাইল অভিজ্ঞ), প্রঃ এ্যাশার শ্যাপিরো (জেট প্লেন ইঞ্জিনের কাজ বিখ্যাত), প্রঃ জেম্‌স্‌ ফে (ব্যালিস্টিক ও অ্যাণ্টিব্যালিস্টিক মিসাইল-এ অভিজ্ঞ)। প্রোবস্টাইন ও পরে ডেটন, গ্রিনেত্তি ও গ্রুণবার্গ এইভাবে রিসার্চকে সমাজবিষয়ক সমস্যায় পুনর্নিযোজনের কথা (রিকনভার্সন এরই নাম) বলেন। নানা সমস্যা আলোচিত হয়।

আলোচনার শেষে প্রশ্নোত্তরে একজন প্রফেসর গ্রুণবার্গকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন : "প্রফেসার গ্রুণবার্গ, আপনারা এই সিস্টেমের ভেতরে কাজ করছেন ত্রিশ বছর এবং আপনারা এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, মিসাইল ইত্যাদি করেছেন। ভবিষ্যতে আপনাদের যা বলা হচ্ছে, তাই করবেন না কি করে জানছেন?" গ্রুণবার্গ : "আমি এর কোন সহজ জবাব দিতে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, বাইরে থেকে নীতিবিচার ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে লাভ নেই। আমাদের কিছু করবার মতো রাজনৈতিক উপায় বার করতে হবে। কোনায় দাঁড়িয়ে বকবক করা, মিসাইল তৈরী করার মতই অর্থহীন।"

প্রশ্নকর্তা : "মিসাইল খুবই অনীতিগতভাবে স্পষ্ট জিনিস ও বর্তমান! নীতিবিচার আমি করছি না। আমার একটা ভয় রয়েছে মনে!"

তৃতীয় বৈঠক : শিক্ষাজগৎ ও সরকার।

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সম্বন্ধে অধ্যাপক হাওয়ার্ড ৎসিন (যাঁর পরিচয় বইটিতে ভুলক্রমে বাদ পড়ে গেছে) তৃতীয় বৈঠকের শুরু করেন। বুদ্ধিজীবী ও মূর্খ, আমেরিকার পি এইচ্‌ ডি প্রেসিডেণ্ট উড্রু উইলসন ও জার নিকোলাস, সমানতালে এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে। এ থেকেই বোঝা যায় বুদ্ধির সঙ্গে চরম নির্বুদ্ধিতার এক যোগাযোগ। "Idiot's delight" বলেছেন রবার্ট শেরউড। যুদ্ধের দুই মুখ। একটা হেলেন অফ ট্রয়, আরেকটি বেবুনের পশ্চাদ্দেশ—বলেছেন জিরাদো। ৎসিন্‌ যুদ্ধের মূর্খতা দিয়ে শুরু করেছেন এভাবে।

তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য সমান বলিষ্ঠ। সরকার ক্ষমতা ধরে। তাই, কোনো সরকার ক্ষমতার ভিন্ন কোনো উৎস ততটাই পছন্দ করে, যতটা জন্‌ ডি রকিফেলার পছন্দ করেন তাঁর আওতার বাইরের তৈল শোধনাগার। ইতিহাসে, সরকার তত বেশী টেঁকে, যত বেশী তারা অন্য ক্ষমতার সূত্রকে দমন বা আত্মসাৎ করতে পারে।

তাই যদি ছাত্ররা আর বিজয়ের জন্য প্রাণপাত না করতে চায়, যদি তারা জয়লাভ কথাটাতেই বিশ্বাস না করে, যদি শিক্ষাজগৎ যুদ্ধকে মূর্খ মনে করে সরকারকে বাধা দেয়, তাহলে সরকার সাধারণ উপায়ে তাদের দমন করবে, আশ্চর্য কি! তাছাড়া বন্ধুত্ব ও বিলিয়ন ডলার—এর লোভ? কত চাকরী! পদার্থবিজ্ঞানী এটম বোমা তৈরী করবে। প্রাণীবিজ্ঞানী রোগের বীজাণু। রসায়ণবিদ হলে নার্ভ গ্যাস তৈরী করবে, যাতে ছয় হাজার ভেড়া মারা গেল উটা প্রদেশে। ("অবশ্য ভেড়া, মানুষ নয়। কিন্তু মানুষও ভেড়া হয়ে যাবে না তো?") রাজনীতি-বিজ্ঞানী হলে কাউণ্টার ইন্‌সার্জেন্সি যুদ্ধপ্রক্রিয়ার ওপর কাজ করবে। এম আই টি এই কাজের জন্য নাকি বিখ্যাত!

কিন্তু তাহলে সরকারের ভয়ের কি কারণ আছে? ৎসিন্‌ এ প্রশ্নর যা জবাব দিয়েছেন, সর্ব-

যুদ্ধের পিতা হলেন প্রগতিবাদীরা। উইলিয়ম বাণ্ডি, ম্যাক্‌জর্জ বাণ্ডি, জন কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, এড্‌লাই স্টিভেন্‌সন, হুবার্ট হাম্‌ফ্রি। একটি প্রশ্ন মান্‌ তোলেন, যা নিয়ে পরেও অনেক আলোচনা ওঠে। ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা কেন এটম বোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি? মানের মতে (১) তাঁরা জানতেন তাঁদের সরিয়ে অন্য বিজ্ঞানী-দের দিয়ে কাজটি করানো যেতো, (২) তাঁদের প্রতিবাদের ইচ্ছাও হয়নি।

মিলিটারী বা ক্যাপিটালিজম্‌কে সরাসরি আক্রমণ করা তো সম্ভব নয়। কেউ ভাবে না, আমি ক্যাপিটালিজমে যাচ্ছি। তারা বলে, আমরা যাচ্ছি জেনারেল মোটর্স-এ, ফোর্ড ক্রাইসলার, আই বি এম, সি আই এ, এ এফ এল, সি আই ওতে—নামগুলি কি খুব আলাদা? আমরা সবাই সেই লোকটিকে চিনি যে ফিসফিস করে বলে, "আমি এদের কাছে বিক্রী হয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে, জানি। কিন্তু একটু দাঁড়াও। আসছে মাসেই আমি সমস্ত চক্রান্ত ফাঁস করে দেব। তখন আমি তো কেউ কেটা নয়...তখন আমার প্রতিবাদে গর্জে ওঠার অন্য অর্থ দাঁড়াবে।" প্রকৃতজীবনে, কেউ কেটা নয় এমন লোককে প্রতিবাদ করে উঠতে দেখা যায় খুব কমই। মান্‌-এর মতে সরকারের সঙ্গে থেকে তাকে পরিবর্তন করা সম্ভব না।

ক্যালিফোর্ণিয়া বার্কলের সোশিওলজি ইতি-হাসের অধ্যাপক ফ্রানজ্‌ শুরমান্‌ চীন ও আমেরিকার বৈদেশিক নীতিবিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধবিরোধী। যুদ্ধ ও শহরের মৃত্যু এই দুটিই ধণতন্ত্রের বিভীষিকা। তিনি যা বলেন, তা আমরা আগেও শুনেছি Who Needs the Negroes বই-এ (পেপারব্যাক)। ওক্‌ল্যান্ড বা হাণ্টার্স পয়েণ্টের মত সানফ্রান্সিস-কোর কালোবস্তিতে (ghetto) দোকানই নেই বললে হয়। দোকান যা আছে, তাতে চড়া দাম। আমেরিকার বড়লোকরা অবশ্যই শহরে থাকে না। তাদের দামী গাড়ী থাকে। শহরে তো আবর্জনা ও নিগ্রো। তাছাড়া শহরে নিগ্রো রায়ট ঘটানো হয়। এবং তারপর চলে রায়ট পুলিশের তাণ্ডবলীলা। শুরম্যান তাই এক কথায় বলেন : আমার কাছে বর্ণবিদ্বেষ মানেই শহরের মৃত্যু।

রিসার্চের বিষয়ে শুরম্যান্‌ বলেন : "ঘটনার পেছনের লজিক বার করার একটা আনন্দ থাকলেও ক্রমশঃ তা গতানুগতিক হয়ে যায়। তখন বাকি থাকে সমস্যা সমাধান (problem solving)। কে সমস্যা দেয় তার ওপর নিশ্চয়ই সমস্যার গুরুত্ব নির্ভর করে।" বিশ্ববিদ্যালয় তো গোটা সরকারী তন্ত্রেরই অংশ। এ ব্যাপারে মানের সঙ্গে তিনি একমত। টাকাও ফেডারেল টাকা। একমাত্র উপায় টাকা নিয়েও নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সমস্যা নেওয়া ও সমাধান করা। তা কি সবসময়ে সম্ভব?

অর্থনীতিবিদ শেনলিং, হয় চটে নয় ঠাট্টা করে শুরু করেন, রাবিনোভিচ ও মানকে নিয়ে। বার্ণাড ফেল্ড যখন তাঁকে "উক্‌স"-এর প্রস্তাব পাঠান তাতে ছিল : "একদল বিজ্ঞানী আমেরিকান সরকারের ধ্বংসনীতির উদ্ভাবক। কিছু গণ্যমান্য বিজ্ঞানী বিরোধিতা করেও খুব একটা কিছু করতে পারেননি।" শেনলিং ভাবছিলেন, তিনি কোন দিকে? রাবিনোভিচের কথায় তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি কোনো দিকেই নয়। তিনি বিজ্ঞানীই নয়, অর্থ-নীতিবিদ্‌।

আর মান্‌সাহেব তাঁর ক্লাশে সবিনয়ে আসবেন কিনা, এ প্রশ্নটি শেনলিং-এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাজগৎ তখনই একটা গোষ্ঠী হিসাবে সম্ভব, যখন পরস্পরের প্রতি সকলের শ্রদ্ধার ভাব থাকে। এবং তা কি আজ আছে?

শেনলিং একটা পরিস্কার ভাগ করতে চান। এক ভাগ সরকারের বিরোধিতা করেই যেটুকু পারে করবে। আর অন্য ভাগে শেনলিং নিজে। তিনি মনে করেন আমেরিকা সরকার শতছিদ্র। সর্বক্ষণ গুপ্ত তথ্য ও লোকজন এই সব ছিদ্র দিয়ে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। এবং একটু বিনয়সহ চেষ্টা করলে যে কোন সরকারী ব্যক্তিকেই ধরে উপদেশ দেওয়া যায়। এভাবে কাজ করলে ফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। শেনলিং আরো বলেন কয়েক বছরের মধ্যে টাকা পয়সার সমস্যাটা (money problem) মিটে যাবে। হেলার (Heller) প্ল্যান শহরে টাকা ঢালবে। তখন শিক্ষাজগৎ ও শহরের সরকারী কর্তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বোধ না থাকলে টাকাটায় কাজ কিছু হবে না।

চতুর্থ বৈঠক

এম আই টির এআরোনটিকসের অধ্যাপক ট্রিলিং পরের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চতুর্থ বৈঠকের শুরু করেন। সকালের সভায় তাঁরা এক উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রে আঘাতের নিদর্শন পেয়েছেন। রাবিনোভিচ ও তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে দেখেছেন বিষয়টির সম্পর্কে সকলে কত সচেতন। ট্রিলিং মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষাদান নয়, শিক্ষা সৃষ্টি। (এ ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বলেছেন, কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না)। খালি এই সৃষ্টির কাজে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমান দায়িত্ব। দুই নম্বর কাজ, নিজেদের শিক্ষার খুঁটিয়ে বিচার ও শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ সংস্কৃতির সমন্বয়। তাছাড়া এই শিক্ষার সাধারণ তথ্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গী দুইই তরুণ জেনারেশনের কাছে পেঁাছে দেওয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। তিন নম্বরে, ট্রিলিং বলছেন, "আজকাল অনেকেই অনুভব করছেন সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে থেকেই কাজ করা তাঁদের কর্তব্য, তিনি মনে করেন। এ দিক দিয়ে তিনি রোমাণ্টিক বিপ্লবের বিরোধী—শেলিং-এর সঙ্গেই একমত, যে যদিও কাজটা খুবই শক্ত তবু এভাবেই এগোনো দরকার।"

এর পরের দুটি বক্তৃতা আমেরিকায় সমধিক প্রচারিত। প্রথমটি ক্যালিফোর্ণিয়া ২৯নং জেলার সেনেটর জর্জ ব্রাউন জুনিঅর। দ্বিতীয়টি প্রাণীবিজ্ঞানী নোবেলপুরস্কার প্রাপ্ত জর্জ ওয়াল্ডের "জেনারেশন ইন সার্চ অফ এ ফিউচার।"

ব্রাউন বলেন, আমেরিকান সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র আজ অনুপস্থিত। তাঁর নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের শতকরা একজন মাত্র তাঁকে সক্রিয় সমর্থন জানায়। তিনি মনে করেন, এই শতকরা একজনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ও সক্রিয়ভাবে সঙ্গে পেতে পারে। তিনি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান, রোণাল্ড সেগালের বই-এর উল্লেখ করেন "অ্যান আমেরিকান : এ কনফ্লিক্ট অফ্ ক্লিড এণ্ড রিয়ালিটি"।—সেখানে লেখক বলছেন পৃথিবীর অধিকাংশের কাছে আমেরিকা আজ মুক্তি ও ভবিষ্যতের দ্যোতক না হয়ে অতীত ও পরাধীনতার প্রতীক। প্রতিটি সত্তার স্বাধীনতার কথা বললেও, আমেরিকা যে খোলা সমাজ বলে নিজেকে পরিচয় দেয়, তা সে নয়। টাকার এক-চেটিয়া খেলায় স্বাধীনতার প্রয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। হিংসা বাড়ার কারণ, ভোগ্যপণ্যনির্ভর সংস্কৃতি মানুষকে আনন্দ দেয় না। এভাবে যদি চলে, আমেরিকার স্নায়বিক বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

ব্রাউন জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর এক রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানান : দেশের আগামী পনেরো বছরে, এই সার্ভের মতে, আটটি প্রবণতা (trend) দেখা দেবে। প্রথম হচ্ছে, ব্যায় করবার মতো প্রকৃত আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি।

শিক্ষার বৃদ্ধি হবে। শিক্ষিতরা ক্রমশঃ কাজের বিষয়ে ও শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে।

অপটু শ্রমিকদের জন্য কাজের ভাগ করা চলতে পারে। কিন্তু কলেজশিক্ষিতদের জন্য, কাজের পরিধি বাড়ানোর দরকার হবে, বোধহয়।

প্রতিষ্ঠানদের ক্ষমতা বাড়বে। "দেশের জন্য ভালো" বললেই কোন দেশের পক্ষে যে কোন কার্যসূচী গ্রহণ করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

এইভাবে আটদফা যে সামাজিক প্রবণতার সূচী করেছে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী, তার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন-বেণ্ডিট্দের মতো নতুন বাম তরুণদের বিশ্লেষণের : "কমিউনিস্ট, ট্রটস্কিআইট্, মার্ক্সিস্টরা ক্যাপিটালিস্টদের মতোই সাধারণ মানুষকে উপর থেকে চালানোর কথাই ভাবেন। ফলে গণতন্ত্র এক কর্মসূচী অনুমোদন করার তন্ত্র, প্রণয়নের তন্ত্র নয়।" এই অবস্থার জন্যই, ব্রাউন মনে করেন, ভিয়েতনামের মত ঘটনা আমেরিকার মানুষকে অনুমোদন করতে হয় বা সহ্য করতে হয়।

ব্রাউন অনেক বই উদ্ধৃত করেন—কিন্তু মজার কথা সবগুলিই সমালোচনা থেকে। অবশ্য তা সত্ত্বেও একথা হাজার বার মানতে হয়, ব্রাউনের মত "শিক্ষিত" রাজনীতিবিদ্ পেলে যে কোন দেশ ভাগ্যবান। তিনি যে কত প্রগতিবাদী তার উদাহরণ

তাঁর বক্তৃতার শেষের মন্তব্য—"যদি কোন শিক্ষক ইউনিয়ন সংগঠনের কাজে, ভিয়েতনাম বিষয়ে প্রতিবাদে, জলের তলায় স্কুবা ডাইভিং, যোগাভ্যাসে অভ্যস্ত হন কিম্বা আনন্দ পান এল এস ডিতে বা নিউ থিওলজিতে—তাহলে তাঁর ছাত্রদের তা জানা উচিত। আর এইরকম ধরনের লোকই আমাদের প্রতিষ্ঠানে বেশি বেশি দরকার।"

ছাত্র, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের সমাজের সমস্যা সমাধানের প্রতি উৎসাহের জন্য এম আই টিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি শেষ করেন।

ওআল্ডের লেখার টুকরো উদ্ধৃতি অন্যায়। তাঁর গোটা বক্তৃতার স্বল্পসংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ দেওয়া গেল :

"সবাই অবগত যে পৃথিবীর নানা জায়গায় গত বছর থেকে (১৯৬৬-৬৮) ছাত্রদের বিক্ষোভ দেখা গেছে—ইংলণ্ডে, জার্মানীতে, ইটালী, স্পেন, মেক্সিকোতে আর অবশ্যই আমেরিকায়। এবং মেক্সিকোয় এই বিক্ষোভের মানে ফ্রান্সের সমার্থক নয় বা টোকিওতে এই ঘটনার গুরুত্ব অন্য রকম। কিন্তু ছাত্ররা বিশ্বশুদ্ধ পাগল হয়ে হঠাৎ এই জিনিস করছে, এরকম না ভাবলে এর একটা সাধারণ অর্থ খুঁজতে হয়।

এই অর্থর জন্য অতদূরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি হার্ভাডে ৩৫০ জন প্রথম/দ্বিতীয় বর্ষের ছেলেমেয়ের ক্লাশ নিই। এই কয় বছরে ক্রমশই বেশি করে মনে হচ্ছে কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে—শিক্ষায় ও শেখায়। যেন একটা সাধারণ বোধ যে শিক্ষা এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে।

ক্লাশে বক্তৃতা আর কথোপকথনের যতটা অমিল আছে আমরা ভাবি ততটা সত্যি নেই। বক্তৃতা দিতে দিতে শ্রোতাদের মুখ চোখে পড়ে; এবং নতুন তথ্য বক্তার কাছে ফিরে আসতে থাকে। আমার মনে হচ্ছিল, বিশেষতঃ এবছর, যথেষ্ট যেন ফিরে আসছে না। ছাত্রদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিশেষ কিছু তারা বলতে পারেনি।

কিন্তু, আমার বোধ হয়, আমি যেন তাদের চেয়ে বেশি বুঝি। এই গোটা ছাত্রদের যুগটাই একটা অস্বস্তিতে ভোগে। ওরা বোধহয় এর গোড়ার কারণটা জানেও না। আমি এই অস্বস্তি অনেক বেশী বুঝি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা আমিও এই অস্বস্তির অংশীদার।

কি নিয়ে ছেলেরা এত বিচলিত? ওরা কেউ কেউ বলবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। আমি মনে করি আমেরিকার গোটা ইতিহাসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সবচেয়ে লজ্জাকর ঘটনা। আমেরিকাই যুদ্ধ-অপরাধ (war crime)ধারণার স্রষ্টা। আমরা অনেক যুদ্ধ-অপরাধ করেছি ভিয়েতনামে। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অপরাধ করেছি। নুরেমবুর্গ বিচার ও যুদ্ধাপরাধের প্রস্তাবনার আগেও। জার্মানীর শহরের স্যাচুরেশন বম্বিং এক যুদ্ধাপরাধ বা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা ফেলাও যুদ্ধাপরাধ। আমরা লড়াইএ হারলে আমাদের নেতাদের কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হত, হয়তো।

আমি এই সব ইতিহাস ঘাঁটছিলাম সম্প্রতি। এবং এর মাঝে একটা চালাকি(gimmick) লুকিয়ে আছে। পরিস্কার লেখা নেই। কিন্তু পূর্বাপর সম্বন্ধের মধ্যে আছে। চালাকিটা এই যে, যদি একবার বলা যায়, আক্রান্ত হয়ে কেউ প্রতিরোধ করছে, তাহলেই সব দোষ মাপ। তাই সব দেশের যুদ্ধ-বিভাগই এখন প্রতিরক্ষা-বিভাগ। এ সমস্তই আমাদের যুগের ভাঁওতার অংশবিশেষ। আমেরিকার ভূতপূর্ব সেক্রেটারী অফ স্টেট, ডীন রাস্ক—যিনি মনে করেন যুক্তির অভাবে এক কথা বার বার বললেই বিশ্বাস্য হবে—তিনি তাই বার বার বলেন, ভিয়েতনামে আমরা আক্রমণ প্রতিহত করছি। এবং তাহলে নিয়ম অনুযায়ী যাই আমরা করি না কেন, সবই ন্যায্য।

যুদ্ধঅপরাধের যদি কোনো অর্থ থাকতে হয়, তাহলে তা আক্রমণ প্রতিহত করার বুজরুকির আওতার বাইরে। কতগুলি গর্হিত কাজ সর্বকালে সর্বদেশে সর্ব অবস্থায় অন্যায্য ঘোষণা করা দরকার।

আমার মনে হয় আমরা ভিয়েতনামে হেরে গেছি—যা আরো অনেকেরই মনে হয়। ভিয়েতনামীদের একটা গোপন অস্ত্র আছে—যা তাদের মরতে রাজী হবার ইচ্ছা, আমাদের মারবার ইচ্ছার চেয়েও বেশী। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই : তারা যেন বলছে, "তোমরা আমাদের মারতে পারো, কিন্তু অনেককে মারতে হবে। হয়তো আমাদের সবাইকে।"

ঈশ্বরের কৃপা, আমরা আজও তা করতে প্রস্তুত নই।

তবু আমরা অনেক দূর এসেছি—অনেক আমেরিকান অসুস্থ বোধ করবার পক্ষে যথেষ্ট। এমনকি আমাদের লড়াই করার লোকদের অসুস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জাতীয় প্রতীক পচে দুর্গন্ধ ওঠার পক্ষে যথেষ্ট।...কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধ, লজ্জাকর ও জঘন্য—কিন্তু সেও একটা বৃহত্তর কঠিন পরিস্থিতির একটি বর্তমান রূপ মাত্র।

আংশিকভাবে ছাত্রদের নিয়ে আমার অসুবিধার কারণ, তারা প্রায় সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জন্মেছে। ঠিক দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকান জীবনে কতকগুলি নতুন বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম এগুলি চলে যাবে, আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব। কিন্তু ২০ বছর এই বিকৃতি আমাদের সঙ্গেই থেকে গেল। এগুলোকেই স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ ভাবতে ছাত্ররা অভ্যস্ত। কারণ তারা অন্য কিছু জানে না। তারা ভাবে সব সময়েই পেণ্টাগণ, বিরাট সৈন্য-বাহিনী ও ড্রাফ্‌ট্‌ আমাদের জীবনে ছিল। কিন্তু এসব নতুন জিনিস। এবং আমার মতে আমেরিকা বলতে আগে যা বোঝা যেতো, তার সঙ্গে এসব মেলে না।

কজন জানে যে দ্বিতীয় যুদ্ধের ঠিক আগে আমাদের এক লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল এয়ার ফোর্স সমেত?...এমনকি ১৯৫০এ—সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ, ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিনের দিনেও সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখে।

এখন আমাদের পঁয়ত্রিশ লাখ সৈন্য আছে—ছ'লাখ ভিয়েতনামে, তিন লাখ অন্যান্য প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে, আড়াই লাখ জার্মানীতে। কয়েক মাস আগে আমাদের জানানো হয়েছে তিন লাখ ন্যাশানাল গার্ড ও দু'লাখ রিজার্ভ লোককে শহরে রায়ট দমন করার জন্য বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এরকম সৈন্যবাহিনী রাখলে তারা কাজ খুঁজবেই! ভিয়েতনাম আজ বন্ধ হলে কাল বিদেশে অন্য কোথাও, বা দেশে অন্য কোন ঐরকম কাজে, তারা লিপ্ত হবে।

আর ড্রাফট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য খুব সহজ। ড্রাফট তুলে নেওয়া হোক।...ছ'হাজার ড্রাফটের বয়সী ছেলে ক্যানাডায় গেছে, দু'তিন হাজার ইওরোপে এখন অবধি পাওয়া হিসেব অনুযায়ী। মনে হচ্ছে আরো বেশী যাবে বলে তৈরী হচ্ছে।... ড্রাফট বন্ধ করার একটি বিল আসছে কংগ্রেসে ম্যাক্‌গভার্ণ, হ্যাটফিল্ড থেকে গোল্ডওআটার পর্যন্ত সকলের উৎসাহে। আশা করি বিলটি গৃহীত হবে; কিন্তু যখনই আমি দেখি ব্যারী গোল্ড-ওআটার ও আমি এক মত ঘটনাটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। নানাজনে একমত হবার কারণ—ড্রাফট্‌ বন্ধ করারও নানা উপায় আছে। আমার মনে হয় ড্রাফট্‌ বন্ধ করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও কমানো দরকার।...

আরেকটা কথা এই বিষয়ে শোনা যায় : স্বেচ্ছা-সেবক দিয়ে সৈন্যদল গড়তে গেলে মাইনে অনেক বাড়াতে হবে। জোর দিয়ে কথাটা বারে বারে বলা হয় বলে অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করে। আমি মনে করি না কথাটা ঠিক। আমাদের বর্তমান সৈন্য-বাহিনীর অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবক। প্রথম পর্যায়ে যারা ঢোকে তাদের ৪৯% সত্যি স্বেচ্ছায় আসে, ৩০% ড্রাফটের চাপে কিন্তু স্বেচ্ছায় ও মাত্র ২১% ড্রাফটে! দ্বিতীয় পর্যায়ে তো সকলেই স্বেচ্ছা-সেবক বটেই।

...আরেকটা জিনিস আমাকে খুব বিচলিত করে। ইদানীং আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান পরিষদ ওআশিংটনে অফিস করে...সকলের মতো "লবী" করতে।...এইসব অফিসে ব্যুরোক্রাটরা আরো টাকা, আরো ক্ষমতার পেছনে ছোটে। আর প্রতিরক্ষা বিভাগে তো টাকা উড়ছেই!

এর ফলে নানা অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। আমি প্রাণীবিজ্ঞানী। এক বছর আগে আমেরিকান প্রাণী-বিদ্যা ইনস্টিট্যুট (A.I.B.S.) এক ন্যক্কারজনক বুজরুকির (nauseating display of hypocrisy) চালে ফোর্ট ডেট্রিক প্রস্তাবিত দুটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে। প্রথমটার নাম ডিফোলিয়েশন (ভিয়েতনামে জঙ্গল ধ্বংসের নামে সবুজবিধ্বংসী অভিযান) না দিয়ে দেওয়া হল, "লিফ এ্যাবসিশান"

বা গাছের পাতার অসুখ। দ্বিতীয়টির সঙ্গে ভাইরাস ছড়িয়ে রোগপ্রচারের কোন সম্পর্ক ছিল না। না ঃ তার বিষয় ছিল "বাইরের ডি এন এ অনুপ্রবেশের ফলাফল"!...

আমার মনে হয় না এই মিলিটারী প্রতিষ্ঠান ও তার আশি মিলিয়ন ডলার বাজেটের সঙ্গে থেকে অতীতের আমাদের জানা আমেরিকার মান বজায় রাখা সম্ভব। সমস্ত দেশের জীবনকে কলুষিত করছে। সব কিনে নিচ্ছে : ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি শেষ অবধি শ্রমিক ইউনিয়ন পর্যন্ত।

প্রতিরক্ষা বিভাগে অবশ্য সব সময়েই অর্থাভাব শোনা যায়। কিন্তু অভাবসত্ত্বেও আশি বিলিঅন ডলার নিয়ে তারা বেশ কিছু রোমাঞ্চকর অমানুষিক কাজ করে ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ রকি পাহাড় অঞ্চলে ডেনভারের কাছে, এক স্নায়ু পঙ্গু করা বিষ তারা বিরাটভাবে তৈরী করা শুরু করে। ফলে অচিরে আনুষঙ্গিক আবর্জনা ফেলার এক সমস্যা দাঁড়ালো। তাতেও না ঘাবড়ে তারা দু'মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ডেনভারের তলায় এমনভাবে বিষাক্ত জল ভরতে থাকল যে গত দু'বছর ধরে ডেনভারে ক্রমশঃ বেশি করে ভূকম্পন দেখা যাচ্ছে। একটা বড় রকমের ভূমিকম্পের সম্ভাবনাও রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে ঐ বিষজলের ভূগর্ভ হ্রদ যথাস্থানে ছেড়ে রাখাই শ্রেয়? না ঝুঁকি নিয়ে তাকে সরানো ভালো? (ন্যুইয়র্ক টাইমস্ জুলাই ৪, ১৯৬৮; সায়েন্স, সেপ্টেম্বর, ২৭, ১৯৬৮)।

উটার স্কাল্ উপত্যকায় নার্ভগ্যাসে মৃত ৬০০০ ভেড়ার কথা অনেকেই জানেন। অদ্ভুত ঘটনা, যার কারণ আজও সঠিক বোঝা সম্ভব না; কারণ নিকটতম পরীক্ষাগার ছিল ৩০ মাইল দূরে।

ভিয়েতনামে যে পরিমাণ বোমা ফেলা হয়েছে তা চিন্তার অতীত। মে সান্ নামে একটা গ্রামেই যা পড়েছে তা ৪২-৪৩ সালে গোটা ইউরোপে বোমাবর্ষণের বেশী এবং জাপানে গোটা ২য় বিশ্বযুদ্ধে যা পড়েছিল তার চেয়েও বেশী। বসন্তের মত চেহারা হয়েছিল সেখানে মাটির। (ন্যু ইয়র্ক টাইম্স্, মার্চ ২৮ ১৯৬৮)।

সরকারের অস্তিত্বের অর্থ হতে পারে বাঁচার ও বাঁচানোর কাজে। আমাদের সরকার জীবন ছেড়ে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—মরা ও মারার কাজে! তাই প্রতিরক্ষায় আমাদের জাতীয় বাজেটের ৬০% ও জাতীয় আয়ের ১২% চলে যায়।

আবার আলোচনা হচ্ছে আমরা এ বি এম ব্যবহার করব কিনা। এখানে অনেকে সে বিষয়ে বলার জন্য আছেন। আমি ১½ বছর আগের এম আই টি ও হার্ভাডের এক আলোচনা সভায় একটি ঘটনার কথা বলব। সবাই বলছিল সেণ্টিনেল ও এ বি এম অপ্রয়োজনীয়। সবচেয়ে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞরা কিন্তু বললেন "এ তো সব স্থির হয়ে গেছে। সেটা ধরে নিয়ে আমরা এগোই। মৃত একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই।"

এই জাতীয় কথাবার্তার প্রথা এখন সর্বাধিক প্রচারিত। ভাগ্যক্রমে এ বি এম মৃত প্রশ্ন নয়। এ বি এম আণবিক অস্ত্র। আণবিক অস্ত্রকে বন্ধ করতে ব্যবহৃত আণবিক অস্ত্র। এবং সমস্ত আণবিক অস্ত্র বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর জীবিত লোকের জীবন্ত প্রশ্ন আছে!

"এই সমস্তই জীবনের সত্য, একে মেনে নিতে হবে" এই প্রথা চলবে না। এ সমস্ত জীবনের সত্য না, মৃত্যুর সত্য। আমি এ সত্য মানি না, আপনাদেরও অনুরোধ করি মানবেন না। বারেবারে আমাদের ওপর চাপ দেওয়া হয়, "স্থির হয়ে গেছে" এরকম প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। কিন্তু এ সমস্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্ত নিয়েই আমাদের লড়তে হবে, যা স্থির তাকেই অস্থির করতে হবে।

আমাদের বলা হয়েছে রাশিয়া ও আমেরিকা যা অস্ত্র তৈরী করেছে তাতে পৃথিবীর প্রতি নরনারী শিশুর মাথা পিছু ১৫ টন টি এন টির সমান বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে। আরো নাকি তৈরী করতে হবে—কারণ এই নাকি "জীবনের সত্য ঘটনার অন্যতম।" অস্ত্রসংবরণ হবেই। তার আগেই আমরা আরো বেশ কিছু অস্ত্র করে ফেললে তবেই বেশ এগিয়ে গিয়ে অস্ত্রসংবরণ করেও আমরা রাশিয়াকে টেক্কা দিতে পারব আমাদের প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী বলেছেন।

এ সমস্তই পাগলের প্রলাপ। আণবিক অস্ত্রের প্রতিরোধ নেই। এ বি এম তৈরীর চেয়ে অনেক

সহজ এ বি এম এড়িয়ে আণবিক বোমা ফেলা। আমরা এ বি এম-এর সঙ্গে সঙ্গেই তৈরী করছি মির্ভ (MIRV) যা দিয়ে এ বি এমকে নিষ্ক্রিয় করা যায়। আণবিক যুদ্ধ ঘটলে তাহলে কম করেও পাঁচ কোটি আমেরিকান মারা যাবে।

এবং বাকীরা খবরের কাগজে খবরটা নিশ্চিন্তে পড়বে কি? হিরোশিমা, নাগাসাকিতে দু'লাখ লোক আমরা মেরেছিলাম কি শুধু? না সমান সংখ্যক লোককে অন্ধ, খোঁড়া করে, পুড়িয়ে বিষিয়ে, দীর্ঘদিন কষ্ট দিয়ে মেরেছি? এই ভাবেই ঘটনাটা হবে। শুধু কয়েকজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নয়—দেশজোড়া অসহায়, আহত, স্থিরমৃত্যু লোকেদের তিলে তিলে দগ্ধানো। আর যারা বেঁচে গেছে তাদের সশস্ত্র চেষ্টা, অকলুষিত খাবার ও জল অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা।

কয়েক মাসে আগে জর্জিয়ার সেনেটর রিচার্ড রাসেল বলেছেন, "যদি আবার এ্যাডম ও ইভ থেকে শুরু করতে হয় আমি চাই তারা হবে আমেরিকান, ইওরোপীয় নয়।" ঐ কথা কি আমেরিকান সেনেটরের দেশপ্রেমিক বক্তৃতা? তাহলে আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই : এই একজন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অন্ততঃ মনে করে ঐ কথাগুলি দাগী আসামীর উন্মত্ত প্রলাপের সমান।

আমি জানি কি আমাদের ছাত্রদের অস্বস্তিতে ফেলছে। আমরা এই নতুন যুগের মানুষদের সামনে দাঁড়িয়েছি, যারা জানে না নিশ্চিতভাবে, তাদের কোন ভবিষ্যৎ আছে কিনা।

আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার ভবিষ্যৎ, বলতে গেলে, আমার পেছনে রয়ে গেছে। কিন্তু এই আমার ছাত্রদের কথা সব সময় আমার মনে খোঁচায়; আর আমার বাচ্চারা আছে—দু'জন, একজন সাত একজন নয় বছরের। এদের সকলের ভবিষ্যৎ আমার কাছে আমার নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে অসীম মূল্যবান। তাই এরা শুধু একা নয়। আমাদের যুগের লোকও এদের সঙ্গে জড়িত। আমরা সবাই এক-সঙ্গেই আছি। আমরা চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি এ চিন্তাই ভুল, তুচ্ছ চিন্তা। ওভাবে চিন্তায় শুধু পরস্পরের মৃত্যু। আমরা এক জাতি এবং গোটা দুনিয়া আমাদের জিতে নিতে হবে। এই বিশ্বজগতে জীবন আরো আছে। কিন্তু আমরাই একমাত্র মানুষ।

আমাদের কাজ জীবনকে নিয়ে, মৃত্যুকে নিয়ে নয়।"

জীবনবিদ্যার নোবেল পুরস্কার ধন্য এই জর্জ ওয়াল্ডের মত সালভাদর লুরিয়ার মত জীবনমুখী মানুষের কাজে লেগে। ওয়াল্ডের পর মিলকাওই-র ১৫,০০০ ড্রাফট্ ফাইল পোড়ানোর জন্য অভিযুক্ত বর্তমানে কারারুদ্ধ ১৪ জনের একজন, ফাদার মুলানী, বক্তৃতা দেন। তিনি যা বলেন সংক্ষেপেই বলতে হচ্ছে। "কথা বলে আর আজকাল কাজ হয় না। এবং ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাবান এদের মধ্যে ফারক্‌টা বেড়েই চলেছে।" তাই তাঁরা প্রতিবাদ হিসাবে ঐ ফাইল পোড়ান্। নাপাম দিয়ে এই সমস্ত ফাইল পোড়ানোর সময়ে কিছু ঘাস পুড়ে যায় ওআর মেমোরিয়াল পার্ক এ। তার জন্য তাঁদের প্রায় ৮৪ ডলারের বিল পাঠায় আমেরিকান সরকার—বিচারের আগেই। তাঁরা বলেন, যখন আমেরিকা ভিয়েতনামের ঘাস পোড়ানোর ক্ষতিপূরণ দেবে তখন তাঁরা এই টাকা দেবেন। এবং তাঁরা আমেরিকার আদালতের কাছে দাবী রাখেন : তাঁদের অপরাধ বিচার করবার সময়, এই অপরাধ করার কারণগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে। কে তাঁদের এই অপরাধ করিয়েছে? সুন্দরভাবে তিনি দেখান, আমেরিকান সরকার ড্রাফট্ নীতি জবরদস্তি চালিয়েছে বলেই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ তাঁদের করতে হয়েছে। একজন মানুষের বাড়ীঘর সরকার বাজেয়াপ্ত করলে সে নানা আইনের আশ্রয় পায়। অথচ তার জীবন বাজেয়াপ্ত হলে কোনো আইনতঃ প্রতিবাদের পথ নেই। অগত্যা, বে আইনী প্রতিবাদ করতে সে বাধ্য। "আমেরিকার সমাজে জীবনের চেয়ে জিনিসপত্র অনেক মুখ্য। এই ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে।"

ষষ্ঠ বৈঠক।

পঞ্চম বৈঠকে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর আলোচনা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হলেও সংক্ষেপে সে-

বিষয়ে কিছু লেখা শক্ত। ষষ্ঠ বৈঠকে বেটে, মেসেলসন্ ও আলপেরোভিচের বক্তৃতার সারাংশ দিয়ে তাই আমরা শেষ করব। ষষ্ঠ বৈঠকের শেষের আলোচনাও সংক্ষেপে বিবৃত হবে।

বেটে এক বছর আগে এ বি এম-এর বিরুদ্ধে বলেন, যার ফলে সেনেট কিছুটা নিশ্চয়ই এ বি এম বিরোধী হওয়ায় সাহায্য হয়। তিনি বলেন, তাঁর উপস্থিত বক্তৃতা বা আগের রিপোর্ট লেখা সম্ভব হয়েছে কারণ, তিনি ভেতর থেকে এ বি এম সম্বন্ধে জেনেছেন, পড়েছেন। এবং এইভাবে না জানলে বোঝা শক্ত কেন এ বি এম প্রতিরোধ অস্ত্র হলেও অর্থহীন, অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও যুদ্ধের প্ররোচনা-মূলক।

হানস্ বেটের প্রবন্ধে বোঝা যায় কিভাবে আজ সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা, (কিছুটা চীনও) বহু অস্ত্র তৈরী করে ও জমিয়ে শেষ অবধি এমন অবস্থায় এসেছে যেখানে মত বা নীতিগত বিরোধ তাদের মধ্যে থাকতে পারে না। থাকতে পারে শুধু ভয়। এবং এই ভয়ের ফলে তাদের মধ্যে সমঝোতা একটা হতে বাধ্য : এ যেন বেটে ১৯৬৯ সালেই ভবিষ্যদ্বানী করেছেন। বেটে মনে করেন আণবিক পোলারিস মিসাইলে সজ্জিত সাবমেরিণ বা সমতুল্য রাশিয়ান সাবমেরিন বাহিনী বিশ্বের মঙ্গলকারক। কারণ উভয় পক্ষ জানে অপরের দেশ ধ্বংস করলেও রক্ষা নেই। এই সাবমেরিণ বাহিনী আক্রমণকারী দেশকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট।

স্পার্টান ও স্প্রিণ্ট দু-রকম এ বি এম, প্রথমটি কয়েকশো কিলোমিটার দূরে মেগাটন বোমা দিয়ে আক্রমণকারী ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংস করে। দ্বিতীয়টি দশ বিশ কিলোমিটার মাত্র রক্ষা করতে পারে, কিলোওয়াট ওজনের আণবিক বিস্ফোরক ব্যবহার করে। দুই যন্ত্রই রাডার ব্যবহার করে—এবং মিসাইলের সঙ্গে বেলুন বা অন্য ছোট ছোট টুকরো রেখে রাড়ারকে ঠকানো সহজ। এবং শেষ অবধি তাই এ বি এম দিয়ে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। বরং পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং ভয় এই দুটিই বাঁচার প্রকৃষ্ট পন্থা!

মেসেলসন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "ওআর ট্রিব্যুনাল" ও সেনেট বৈদেশিক নীতি দপ্তরের কাছে তাঁর ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতার কথা জানান। হার্ভাডের প্রাণীবিদ্যার এই অধ্যাপক পরিস্কার জানান—সমস্ত রকম গ্যাস ব্যবহার যুদ্ধে বন্ধ করতে হবে। প্রাণ-হানিকর নয় এরকম গ্যাসও (সি এস ইত্যাদি) যদি ব্যবহার করতে দেওয়া হয় আজ, তবে কাল কোন দেশ সি এস বলে ফস্‌জিন চালাবে না—এ নিশ্চয়তা আজকের দুনিয়ায় মেলে না। দ্বিতীয়তঃ ভিয়েত-নামে যেভাবে সি এস ছড়ানো হয় তাতে বন্ধ পরিসরে এরকম ধোঁয়া হওয়া সম্ভব যাতে মানুষ মারা যায়। মারা না গেলেও এই সি এস-এর কণা বারে বারে ফুসফুসে গেলে তার পরে কি ঘটতে পারে সেবিষয়ে কোন পরীক্ষা হয়নি। চতুর্থতঃ সি এস দিয়ে রায়ট বন্ধ করা এক জিনিস। আর একজন ভিয়েতনামীকে সি এস দিয়ে আচ্ছন্ন করে বোমা, মর্টার ও শত্রুসৈন্যের গুলির সামনে তাকে ফেলা সমান জিনিস নয় কখনই।

মেসেলসন দৃঢ়ভাবে দাবী করেছেন আমেরিকা গাছ ও ধানবিধ্বংসী ফাংগাস ও গ্যাস ভিয়েত-নামে ব্যবহার বন্ধ করুক। বাইওলজিক্যাল যুদ্ধ অবশ্য অদ্যাবধি কেউ করেনি। তাকেও আন্তর্জাতিক আইন করে বন্ধ করা হোক—এই তাঁর দাবী। তিনি বলেছেন, আমেরিকাই প্রথম কেমিকাল ও বাইওলজিকাল অস্ত্র সংবরণের জেনেভা প্রস্তাব তোলে। কিন্তু লজ্জার কথা এ বিষয়ে সরকার আজও মনস্থির করতে পারেনি। তিনি আরও বলেছেন, এই রকম যুদ্ধে আমেরিকার সমূহ পরাজয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা। ফলে এই জঘন্য জিনিস বন্ধ করার জন্য আমেরিকা এগিয়ে আসুক। অবশ্যই তিনি একথাও বলছেন যে, আণবিক অস্ত্র-সংবরণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবু সে ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি প্রয়োজন। কিন্তু কেমি-ক্যাল ও বাইওলজিকাল যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকা একাই এগিয়ে যেতে পারে এবং যাওয়া উচিত।

আণবিক যুদ্ধের ঐতিহাসিক আলপারোভিচ্। নীলস বোর, লিও জিলার্ড, জেম্‌স্ ফ্রাঙ্ক ও ইউজিন রাবিনোভিচ-এর মতো কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের বাদ দিয়ে বাকী আণবিক যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের বিষয়ে তিনি একটি কথা 'প্রস্তাব' করেছেন : স্কিৎসোফ্রেনিয়া।—প্রায় সেই মানসিক বিকার দেখা

গিয়েছিল এই পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও সংঘবদ্ধ মানুষদের মধ্যে যাঁরা দৈনিক বারো ঘণ্টারও বেশি পরিশ্রম করেছেন আণবিক বোমার পেছনে। অথচ যখন অত্যন্ত গণ্যমান্য বোর ইত্যাদিরা প্রস্তাব করেছেন তাঁদের এই বোমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে দাবী জানাতে, তা তাঁরা করতে পারেননি। ওপেনহাইমারকে "বলা হয়েছিল" জাপান আমেরিকা আক্রমণ করতে পারে। এবং এই শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে তিনি সহকর্মীদের বলেন, বোমা বন্ধর চেষ্টা না করতে। এডওআর্ড টেলারের ভাষায় "ওপেনহাইমার বিনয়ী ও নিশ্চিত ভঙ্গীতে আমাকে জানালেন যে, বিজ্ঞানীদের সম্মান রাজনীতিতে জড়ানো উচিত না। সপ্রশংস ভাষায় (in glowing terms) তিনি জানালেন এসব প্রশ্ন ওয়াশিংটনে গভীরভাবে চিন্তা করা হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ, দেশের বিবেকবান ও এসব ব্যাপারে জ্ঞানী লোকেদের হাতে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে আমার মনের ভার তিনি তুলে নিলেন। জিলার্ডের আবেদন নিয়ে আমি আর ঘুরলুম না। আজ আমার অনুশোচনা হয়।"

জাপানের আক্রমণের দিন ছিল ১৯৪৬-এর বসন্তে এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বরে একটা ছোট খাট আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যেই কিন্তু জাপান রাশিয়া মারফৎ শান্তির চেষ্টা করেছিল এবং রাশিয়ার ৯ই আগষ্ট যুদ্ধঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই আক্রমণে প্রত্যাহৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। সবচেয়ে মজার কথা বোর, জিলার্ড ইত্যাদিদের আপত্তির কথা ওপেনহাইমার প্রমুখরা বন্ধ করায়, সরকার এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। তাছাড়া বোর, জিলার্ড ইত্যাদিরাও আর কোন চেষ্টা করেনি। এদিকে আলপারোভিচ দেখাচ্ছেন জেনারেল কার্টিস লে মে, এডমিরাল উইলিঅম লিহি, যুদ্ধসংক্রান্ত এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী জন ম্যাক্‌ক্লয় ও সবশেষে ভবিষ্যৎ প্রেসিডেণ্ট ডুইট আইসেনহাওয়ার—এঁরা কিন্তু বারণ করছেন সরকারকে জাপানে এ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে। বিশেষজ্ঞদের দলে পেলে তাঁদের বক্তব্য শক্তিশালী হত এবং হয়তো অনুকুল ফলও হত।

প্রশ্নোত্তরে বেটেকে এই সময়ের বিষয়ে কিছু বলতে বলা হয়। বেটে বলেন, বিষয়টি তাঁদের বিবেক স্পর্শ করে। তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা করেন যাঁরা ঘটনাটার বীভৎসতা বুঝেছিলেন, যদিও তিনি নিজে বোঝেননি; তাঁরা এত ব্যস্ত ছিলেন দৈনিক কাজে! বোর ইত্যাদি যাঁরা অতটা খুঁটিনাটিতে জড়িত ছিলেন না, তাঁরাই ঘটনাটা ধরতে পেরেছিলেন। এত ব্যস্ত থাকা 'অন্যায়' তিনি মানেন, কিন্তু এরকম সময়ের পেছনে দৌড়ানোর দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল।

বেটে আরও বলেন, জাপানের প্রকৃত পরিস্থিতি তাঁরা জানতেন না। এবং তাঁদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ছিল এখনকার থেকে আরও ক্ষীণ। তাঁরা আপত্তি করলেও কেউ শুনতো না, এই তাঁর বিশ্বাস।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বেটে ও মেসেলসনের সামনে রাখা হয়—বিজ্ঞানীর তার রিসার্চের ব্যবহারের সম্বন্ধে করণীয় কিছু আছে কিনা। বেটের জবাব ও মেসেলসনের জবাবে মতৈক্য দেখা যায় একটি বিষয়ে—বিজ্ঞানীর সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব সম্পর্কে। মতানৈক্য—বেটে মনে করেন কোন রিসার্চ কিভাবে যুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে বিজ্ঞানীর বোঝা সম্ভব না, যতক্ষণ না তার পরীক্ষা হচ্ছে। মেসেলসনের মতে রিসার্চ হওয়া উচিত শুধু সমাজ-কল্যাণকর ও অস্ত্রনিবারণের পথে। কিন্তু গোপনীয়তা, দুজনেই বলছেন, অত্যন্ত গর্হিত।

শেষ প্রশ্ন আলপেরোভিচকে কেন আমেরিকা বোমা ফেলল জাপানে? জবাবে আলপেরোভিচ দেখান পর পর এই দুটি বোমা ১৯৪০এ ৬ই ও ৯ই আগষ্ট ফেলার কারণ একমাত্র হতে পারে সোভিয়েতদেশ ৯ই আগষ্ট জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণার আগেই যুদ্ধ শেষ করা। ১৯৪৫ সালেই নোবেলপুরস্কার বিজয়ী পি, এম, এস ব্ল্যাকেই একথা বলেছিলেন ওপেনহাইমারের "জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ওয়াশিংটনের লোকজন" ভেবে দেখেছিলেন এভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধশেষে ভাগ-বাঁটোয়ারার ও ভয় দেখানোর সুবিধা হবে। তারই জন্য দু'লক্ষ জাপানীর মৃত্যু ও দু'লক্ষ জাপানীর আমৃত্যু যন্ত্রণার মূল্য দিতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না!

পরিচিতি

কমলকুমার ঘটক॥ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক; ইতিহাসের অধ্যাপক।

জিষ্ণু দে॥ প্রাক্তন ছাত্র; এখন কলেজে পদার্থবিদ্যা পড়ান।

তপোব্রত ঘোষ॥ নারীমুক্তি আন্দোলনের জাজ্বল্যমান সাফল্য। দ্বিতীয় বর্ষ বাংলা বিভাগের পুরুষসমাজের একমাত্র ও অনিচ্ছুক ধ্বজাধারী। শেষ দেখা যায় ছাতাবগলে অতি সন্তর্পণে কলেজ স্ট্রীট পার হচ্ছেন।

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়॥ দ্বিতীয় বর্ষ পদার্থবিদ্যার ছাত্র। পৃথিবীর সমুদয় প্রশ্নের প্রতি একটি নির্মল ও আকর্ণ হাসিই এর উত্তর। টিফিন ও পদবীর বিশুদ্ধতা রক্ষায় কিঞ্চিৎ শুচিবায়ুগ্রস্ত।

বার্ণিক রায়॥ বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

বিষ্ণু দে॥

রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়॥ তৃতীয় বর্ষ (বিদায়ী) ইতিহাসের ছাত্র। অতীতে ভালো ক্রিকেট খেলতেন। ঊনসত্তর কিলো ওজনের শরীরে একমাত্র দুর্বলতা অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলা। অবশ্য কারণে চেঁচিয়ে বলা কথা সমান বিরক্তিকর। শতাব্দীর প্রশ্ন : ওর কথার গুরুত্ব দেওয়া হবে অথবা হবে না। উত্তর অবধারিতভাবে ভুল।

স্বপন চক্রবর্তী॥ ইংরেজি বিভাগের পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

Yours Affectionately
K. Zachariah

[*Kuruvilla Zachariah was one of the finest teachers of History in Presidency College. What is not so well known is that he was a prolific and charming letter-writer who seldom forgot to reply when his students wrote to him. The bunch of letters which it is our privilege to publish bears testimony to the warmth of Zach's personality. These letters were written to one of his students in Presidency College, Sri Susilchandra Chatterjee, at present Senior Associate Government Pleader in the Alipore Civil Court. We are extremely grateful to Sri Chatterjee for allowing us to publish these letters. We are also grateful to Dr Nilmoni Mukherjee of the University of Calcutta and Dr Hiren Chakrabarti of Hooghly Mohsin College, who helped to select and edit these letters.—Editor*]

[1]

Dear Susil,

Your card. Thanks.

I am afraid I have never written out my lectures on the subjects you mention—so that you needn't worry about their absence. If you send me the notes sometime before June 15, carefully packed, that will do. I shan't want them before then.

The photo hasn't arrived yet. I shall be very pleased to have it and it'll remind me of one of the best classes I have had. I hope to return to Calcutta in time to wish you all good luck in the exam.

When the B.A. results are out, I wonder if you'd take the trouble to let me know the History results.

[2]

Kurial
Tiruvalla
Travancore
29.5.1923

Your letter of the 22nd. I suppose you wrote it before you received my reply to your first card. I would not willingly have kept your letter unanswered. The photo came the day after I wrote my reply. Perhaps you forget in what a remote part of the country I am and how long letters take to travel all the way here. The epistolary distance between us is 5 or 6 days—depending on the weather ! A gale in the backwater would hold the mail launch up perhaps and that would add on another day.

Thanks for letting me know the results, at least of the first class. I am sorry, of course, that Presidency doesn't stand highest, but it's pretty much what I expected, especially after seeing the papers. The Mahomedan girl, I remember, did very well in my paper, but I can't recollect the Scottish Churches man. But I don't think there is any need to attribute to partiality what may quite well be due to fuller knowledge in one or two papers. I don't think it is fair to jump too readily to such conclusions. Your training in history should have taught you that to ascribe motives is one of the worst temptations of the historian !

You are quite right in proposing to refashion my notes to your purpose and plan of study. Notes or books are of little

use unless one can really assimilate them and make them one's own. Just as I have used the information found in different books to give body to an arrangement which is my own, so should you do too. Take up different questions, study them and write your own outline notes on them. If you like to send some of your outline essays to me, I shall be glad to offer my criticisms and suggestions. Do this for Greek and Roman history as well—I mean, read first Bury or Holm, then write outline essays on a number of subjects pretty well covering the whole ground and read other books for those essays. You may find the following books useful for Greek history—it's a pretty comprehensive list.

General—Bury, Grote, Holm, Thucydides, Zimmern.
Pelop. War—Grundy, Thucydides.
Constitutional—Aristotle's *Constitution of Athens,* Whibley, *Pol. Parties in Athens during the Pelop. War.*
Greenidge—*Greek Constal. History*
Biographical—Abbott's *Pericles,* Glover: *From Pericles to Philip,* Murray: *Euripides and the History of His Age,* Plutrach: *Lives.*
Literary—Sheppard: *Greek Tragedy*
Haigh: *Attic Theatre*
Frere: *Four Plays of Aristophanes* (transl.)
Jebb or Whitelaw: *Sophocles* (transl.)
Campbell: *Aeschylus* (transl.)
Murray or Way: *Euripides* (transl.)
Artistic—Gardner: *Manual of Gk. Sculpture*
D'ooge: *The Acropolis*
Miscellaneous
Cornford: *Thucydides Mythistoricus*
Bury: *Ancient Greek Historians*
Whibley: *Companion to Greek Studies.*

Those are all I can think of now and most of them you'll find in our Library. There may be a few others as well. I am rather rusty in Roman History—but here are a few useful books, besides Mommsen.

Heitland: *Roman Republic* (3 vols.)—the most recent survey of Roman history—dull but accurate.
Ferrero: *Greatness and Decline of Rome* (5 or 6 vols.). Very picturesque but not always very trustworthy.
Oman: *Seven Roman Statesmen.*
Carthage: (*Story of the Nations* Series).
Sandys: *Companion to Latin Studies* (very useful on miscellaneous points).
Plutarch: *Lives.*

Thank you for telling me you appreciated my lectures. It is reward enough for a teacher to hear this from some of his students. I am afraid I am an unambitious person who does not much care for university chairs, but I do care for my class work and for the human contact it brings. That has always been my greatest delight: and one feels it has all been worth while when some students respond. I always wish I could get to know my students better and I hope the wish will be fulfilled at least in your case.

Don't hesitate to ask me for any advice I can give. Best wishes.

[3]

'Kurial'
Tiruvalla
Travancore
23.7.1923

Many thanks for your flattering letter of the 7th. It's good of you to say what you do and I am really glad to find that some of you at any rate appreciated my lectures. I hope, after this year's furlough, to revise my notes and make the lectures fresher and more interesting. Meanwhile, I hope you are all profiting by the lectures and suggestions of my colleagues. But, remember, that the time has come when you must do your work for yourself. All that we can offer is guidance, direction, criticism, advice: the actual search, the reading, the absorption and assimilation of knowledge—these you can and should now do for yourself. This is not perhaps the easiest route to a degree, but it is far the most profitable and interesting—and indeed the only one that'll make a scholar and an educated man of you. So, don't rely too much on lectures—or on professors!

Yours Affectionately Zach

Here are a few books, while I think of it, that may help you. Smith: *Carthage and the Carthaginians;* Einstein : *Tudor Ideals.* Madelin's *French Revolution* is a fascinating book. Fisher's little sketch of *Napoleon* is excellent as a short and suggestive survey. A trilogy of books, as absorbing and thrilling as a detective tale, is Trevelyan's three volumes on *Garibaldi.* If you can get hold of Carlyle: *Mediaeval Political Theory in the West,* Vol. 4, you'll find it has a good account of the papal-imperial conflicts and controversy.

I am no word-painter or I could give you a pen picture of Travancore. My home is about a mile from a small town and we have a few neighbours, a furlong or two off. It's pretty nearly sheer country and one gets country walks and hears country sounds. I have spent many pleasant hours watching the birds of which we have a wonderful variety. I am counting them up and find I've seen between 40 and 50 kinds in Travancore. The house is on the gentle slope of a small hill and there are other little round hills all round, with green valleys between. The valleys are all green with paddy now; and on the hillsides, they cultivate tapioca, peas, plantains and so forth. I love the quiet and the clean country air and the pleasant country sounds and sights.

That must do for the present. I am rather busy at the moment and have no time for more. Do write again—it's delightful to keep in touch with the College and Calcutta.

Don't think too much of the exam. You'll do well enough.

[4]

"Kurial"
Tiruvalla
Travancore
25.8[1923]

Many thanks for your last letter. I was specially glad to see the results. We haven't done badly, though certainly not too well for the Presidency College. Next year I trust we shall recover our lost first place. It's up to you and the others to try and win it back for us.

I am glad Dr. Ghoshal took you to the Museum. There is much to learn there and those actual monuments and relics of the past help to make history concrete. In Calcutta, a comparatively modern town, we miss those architectural and other reminders of history which are so plentiful in an old historic city like London or Winchester in England, like Florence or Rome in Italy, like even Delhi or Agra or Patna in India. Our history tends all the more to degenerate into a mere text-book abstraction, lacking flesh and reality. All the more is there need, therefore, to use all the opportunites which are afforded us so lavishly in the Museum and the Victoria Memorial. We need to remember that history dealt with men like ourselves in conditions of life not very different from ours. How different it is one of the chief tasks of the historian to discover. I have often wished we had a small historical museum in the College: but money was always the difficulty. If, however, old students could help us, we shall not need to spend much to inaugurate a museum of modest dimensions. What do you think of the suggestion? We might get people to give us coins or little archaeological pieces of sculpture or carving, or casts or models or replicas, or perhaps photos—even they would be useful. The contents might be given us—the show cases we should have to get ourselves.

There is a splendid little book by Brown : on Indian coins. You'll find a copy in the Library. I have been reading with great interest a fascinating new work, a companion volume to Wells' *Outline of History,* Thompson : *The Outline of Science.* First rate— and as absorbing as an adventure story. There's yet another on the same lines—*The Outlines of Literature and*

Yours Affectionately Zach
6

Art by Drinkwater and Orpen ; but I don't think it reaches anything like the same level.

We are having bright weather again after two months of almost incessant rain and the sunshine is very welcome. The birds are out again and I can hear the lovely golden oriole pee hoing as I write. I dare say you know it—a beautiful yellow bird with black head and tail, looking like a flash of gold as it flies.

Well, I must stop. Write again.

[5]

"Kurial"
Tiruvalla
Travancore
3.10.1923

Your letter of Sept. 13. I must ask your indulgence for the delay ; and even now I can't write as adequate a reply as I should like.

You want a list for modern history—this is a difficult matter as there are so many books to choose from. But it won't become less difficult by explaining how difficult it is—so I'll plunge in and give you a list of a sort. I divide the books into two classes, A and B, of which A represent the larger standard works and B the smaller, but often more manageable and more useful, manuals.

The Reformation:
Lindsay: *History of the Reformation.* A.
Ward: *The Counter Reformation.* B.

France in the 16th cty.:
The volume in the *National History of France* Series. A.
Armstrong: *French Wars of Religion.* B.

The Thirty Years' War:
Fletcher: *Gustavus Adolphus.* B.

France in the 17th cty:
The volume in the *National History.* A.
Mazarin & Richelieu in *Foreign Statesmen* Series. B.

Germany in the 18th cty.:
Young: *Frederick the Great.* A.
Reddaway: *Frederick the Great* (in the *Heroes of the Nations* Series). B.

Germany in the 19th cty.:
Headlam: *Bismarck.* B.
Ward: *History of Germany in the 19th cty.* A.

Italy in the 19th cty.:
Bolton King: *History of Italian Unity.* A.
Cesaresco: *Liberation of Italy.* B.
Stillman: *Union of Italy.* B.

The Balkans:
Miller: *The Ottoman Empire & its Successors.* B.
Schevill: *The Balkans.* B.

The French Revolution:
Madelin: *The French Revolution (National History).* A.
Malet: *The French Revolution.* B.
Acton: *Lectures on the French Revolution.* B.

Napoleon:
Rose: *Napoleon.* A.
Fisher: *Napoleon.* B. (Home Univ. Liby.—excellent).

France in 19th cty.:
Dickinson: *Revolution & Reaction in France.* B.

Spain:
Hume: *Spain, its Greatness & Decay.* B.

Holland:
Motley: *War of Independence.* A.
Motley: *United Netherlands.* A.
Edmundson: *History of Holland.* B.
Putnam: *William the Silent.* B.

Sweden:
Bain: *Charles XII.* B.

Russia:
Bain, Forbes etc. *Russia from the Varangians to the Bolsheviks.* B.

You'll find Thatcher and Schwill a readable summary : and Hazen is entirely adequate for the 19th cty. Read also a few historical essays like those of Ramsay Muir, Fisher's *Republican Tradition,* Pollard's *Factors in Modern History* and so on. Another admirable book for the 19th cty. is Seignobos. *The Periods of European History* are always useful for reference.

I've not been keeping very fit lately—and am on Sanatogen now. There's nothing to worry about and I shall be all right again in a few days. I am always glad to hear of your activities and studies. Remember me to the others.

Yours Affectionately Zach

[6]

"Kurial"
Tiruvalla
Travancore
Nov. 19, [1923]

You must forgive my delay this time. I have been away a good deal and could not answer very promptly. I can't plead illness as an excuse, because my indisposition was of the most transient type and yielded at once to Sanatogen and a week in the hills. I have been very fit since.

The College magazine has not reached me yet. I wish I could write something for the next issue but I have learnt caution with experience and I know it is far easier to promise than to perform! To discover a subject one can write about *con amore* is to me the most difficult part of authorship. I review a whole series of topics and reject them one after the other. This is not due, I am afraid, to fastidiousness so much as to a certain narrowness of outlook. All that I can promise is that, if some literary angel inspires me with a congenial subject I shall send you the finished product. But don't expect anything till you see it!

There are not many months now between you and the final ordeal. I suppose there is no one so hardy as to face an exam. without a tremor—and the better prepared one is, the more nervous one feels. The fatal thing is not merely to feel nervous—that is an ineluctable infirmity of our flesh : but it is fatal to allow nervousness to conquer us, to feel physically jaded and stale so that the emotion of dread has full sway and meets with no resistance. It is a splendid thing to feel a contempt for the exam., a respectful contempt, that is! Don't overwork, don't allow your brain to be suffocated by facts and keep cool. I am sure you'll do well, if you remember this fundamental precept.

Modern Europe is an absorbing subject, but almost boundless in its scope. One could dip for ever in that ocean without exhausting it. I shan't therefore suggest any select books for you, except just these few which I cannot help mentioning. Have you read G. M. Trevelyan's three Garibaldi books ? As readable as novels. Other books which you can read with real enjoyment are Madelin: *The [French] Revolution;* Rose: *Napoleon;* Cesareso: *The Liberation of Italy ;* Motley : *Dutch Republic.* If all historians had an entertaining style, what a delightful study history would be! Few of us are so austere as to be quite unaffected by form, by style. Expression therefore is as necessary as impression.

Don't hesitate to write if you have anything to ask. I am looking forward already to Christmas at home—after eight years. It revives so many memories of my childhood. A happy home is an abiding inspiration—which is a truth we in India have very imperfectly learnt.

Write again sometime.

[7]

"Kurial"
Tiruvalla
4.2.1924

I am sorry to be so late this time—but in one way and another I have been very busy and had to postpone letters from week to week. However, this letter will come in good time to bring you my good wishes in the exam. Will you pass them on to as many of the others as you meet, especially to Bibhuti Bhusan Banerji—whose letter I haven't time to answer separately. Please thank him from me for it.

I can only reiterate the maxims I have already given you as helpful rules for the exam. Don't overwork at the last moment and remember a fresh mind is worth more than masses of undigested information. Remember your business is to produce a certain impression on the mind of the examiner. Therefore, read the questions through carefully and don't attempt any you are not sure of the meaning of. Answer concisely and to the point. Waste no words. Drive home your main points

forcibly. Have a clear arrangement. Avoid the chronological or obvious arrangement. Think of a fresh and suggestive way of putting things, different from the way in which the great majority will put it. Write simply, but attractively. Try and make it as far as possible a pleasure and a surprise to the examiner to read your answer.

I don't know when exactly the exam. begins—and very likely I shall be there before it begins. I have to join duty on March 7 or 8—so, if you have time, come and see me soon after. It's been very good of you to keep me in touch with the activities of the college and especially of the History Honours Class. I have really appreciated your letters—although I haven't always been able to do as you wish. For instance, I have written nothing for the Magazine—that'll have to wait for next year !

Best luck again.

P.S. This is a very inadequate reply to your long letter—but you'll just have to excuse it this time.

[8]

Piroscafo *Carinthia*
Feb. 1. 1927.

I am answering your letter exactly a month after it was written—but it reached me only a few days ago, redirected from home, in Cairo. You don't seem to have known that I have taken six months' leave and sailed from Bombay on Jan. 5. I got off at Suez and went to Cairo, and other parts of Egypt and also to Palestine and sailed again from Alexandria for Greece on Jan. 31. We expect to arrive at the Piraeus on Feb. 4. After a few days in Greece, I go on to Venice and thence overland to England, which I shall probably reach soon after Feb. 20. My address in England is C/o P. R. Johnston Esq., 25 Goodwyn Avenue, Mill Hill, London, N.W. 7.

It was fascinating to see something of the monuments and memorials of ancient Egypt. There is a fine collection in the Museum, which I visited four times and still felt unsatisfied. As you know, the ancient Egyptians were chiefly concerned with the life after death and many of the exhibits are mummies and cases, funerary furniture of all sorts—but there are also statues and reliefs. I can't describe them all in a letter. Specially interesting were the Tutenkhamen exhibits—wonderfully rich and some of them very beautiful. I also saw the Pyramids—of Gizeh and of Sakkara—and went into several of the private tombs. Perhaps most interesting of all was the visit to the great temples at Karnak and Luxor and to the tombs of the kings, queens and nobles at Thebes. Egyptian history, of which alas ! I know too little, took a new meaning. I shall have much to tell you when I return.

Palestine was fascinating in another way—it has no great ancient monuments, but the country itself is remarkable and dear to all Christians from its associations. As I walked and motored over those hills, looked at those strange lakes, so many of the words and scenes of the New Testament became more vivid and real. It was a pilgrimage in a way—but one doesn't go to Palestine to find a god. He is everywhere, still living, always with us to cheer and teach and guide, if we will listen to His voice and let ourselves be taught.

I am looking forward greatly to Greece. It will be a rare privilege to stand on the Acropolis and look out over Salamis. Think of all the thrilling events that took place within sight of that hill, all the wonderful men who lived there, all the great things they said and wrote and did. One can't stand there without being a little excited—I nearly wrote 'inspired'—but I distrust the inspiration of places. Inspiration comes from people. It is one loving heart, as St. Augustine says, which sets another on fire.

The ship is rolling and I can't write steadily : also my ink has run out. Do write if you can to England. I trust the

Yours Affectionately Zach

New Year will bring you the best of gifts. With many thanks for your letter and good wishes.

[9]

Stansfield Hall
Todmorden,
Yorks
April 12 [1927]

I was very glad to get your letter last mail or the mail before. I don't think I can write now an account, however concise, of all that we saw on the way. To write at length I have neither the time nor the patience : and a brief summary would be useless. When I come back, you must come along some day and see me—and then we can have a good long talk—and I can show you such pictures as I have. We saw a great deal — in Egypt, the wonderful Cairo museum, the Pyramids, the tombs at Sukkara, the monuments at Thebes, Karnak and Luxor—Cnossus in Crete—in Greece, Athens with its Museum and Acropolis, Epidaurus and its perfect theatre, Argos, Mycanae, Tiryns, Eleusis and Olympia. The keenness and vividness of my memories are already fading : but I remember a good deal—and it was all immensely refreshing.

I landed in England on Feb. 23—and since then, I've been busy, visiting friends one after the other. They are all very kind and hospitable, in spite of the long interval of eleven years of absence. The little children I knew have grown up, but are as friendly as ever. I had five precious days at Oxford last term and promise myself another visit next term. I met Prof. H. K. Banerji there and Ajit Hazra, an old pupil. Oxford remains unchanged in essentials, and it was an almost poignant joy to be there. So many memories returned, of what I must count as perhaps the happiest period of my life—memories of chapel and library, of peaceful, leisurely afternoons in a punt on the river below the flowering mays, of walks in the garden, of long evenings beside the fire with one's best friends. Fortunately, most of my friends survived the war and I've been able to meet nearly all of them again. I've done little else since I came.

Before I came to Todmorden, I spent a few days with the Head Master at one of the great schools of England, Christ's Hospital, the school of Lamb and Coleridge and Sir Henry Maine. It's a wonderful place with 22 football fields and 800 boys in residence—I must tell you about it when I return. If only we had one such school in India!

Don't overwork for the exam. I'm sure you'll do well if you don't tire yourself out by overmuch study—a fresh, vigorous mind is of more value than stores of facts and dates. I won't be able to get a reply to this before I leave: about May 25. I expect to be back in Calcutta about June 16—not earlier, perhaps a day or two later. Do come and see me sometime soon, before term begins.

P.S. It's not possible to answer your questions re Haripada Maitra, unless I've more details—e.g. where does he want to do agriculture: Edinburgh, Wales, Oxford? I suggest that he ask the Secy. to the Advisory Council there, Prof. Coyajee, who can give him all the information.

[10]

Kurial
Tiruvalla
June 8 [1928]

Your invitation has just come. I think it is very inconsiderate of you to get married during the holidays ! But, joking apart, I am sorry I can't be present. But perhaps that does not matter very much. You have all my congratulations and good wishes as sincerely and heartily, in my absence as in my presence—and my prayers. This is a great adventure, isn't it ? And at the beginning of such an adventure, one never knows quite how it will end—whether we shall find the Treasure Island and be happy ever after or whether there

will be a mutiny on board or shipwreck of all our plans. But, after all, hope and courage and faith are the very soul of life—and if we have these, and patience and humility, I am sure the adventure is well worth undertaking. It is brave, hopeful men like you that keep the world going around, not cowards like me who shrink from doubtful adventures ! I do wish you all happiness—but remember that it will depend in large measure on yourself. And if the best is to come of it all, remember that your wife is a personality with rights and claims and weaknesses at least equal to yours. I always think respect is the very spirit of a true marriage—a true respect for the personalities of others. It is the hardest thing to learn for all *men* !

If I wrote for a day, I couldn't say all I should like to—and perhaps it doesn't matter very much. What matters is that you should go forth with the good wishes of all your friends—and you certainly have mine. I don't know if it would be proper for me to meet your wife—perhaps it isn't done and maybe she doesn't speak English—but if it is all right, I should like some time or other to have that privilege. I have always regretted deeply the social barriers that keep me out of my pupils' homes.

I am leaving home in a few days to go to Kodai-Kanal, a hill station, for a week or so and then to Calcutta, where I expect to be at the end of June.

Have you had any news of the Research Studentship ?

Do come and see me in July. May you find more than you hope for in this new state and be able to give as much happiness as, I trust, you will get.

[11]

Hooghly College
Chinsurah
July 5, 1933.

I was glad to hear from you again and especially to hear of the safe arrival of your son. Congratulations. I trust both he and his mother are very well.

We had a very pleasant holiday at Shillong and have been back about a week. Baby is flourishing and not merely walks alone—which he has done for a year now—but runs, climbs chairs and tables, goes up and down stairs and does most things that he shouldn't do ! Come and see him sometime.

I am afraid there is no opening in this College nor is there any, to my knowledge, in any other Government College. How is your work at the University progressing ? I hope you have something ready for publication. A Ph.D. would be a considerable asset to you in the search for a teaching post and I hope you will soon be able to present a thesis for the degree. I am sorry you do not seem to care for your teaching work in the University. Why?

When you have a day or afternoon off, come and see us and we can have a good talk. I haven't heard any Calcutta gossip for a long time!

[12]

Hooghly College
Chinsurah
9.1.1936

It is a long time since I heard from or wrote to you. I trust you and your wife and children are all well. I should like to know what you are doing now.

I write this time with a special object. The Hooghly College centenary falls this year and the enclosed appeal will show what our plans are. I believe your father was at the College as a student ; and we are anxious that all old students should share in the Centenary celebration and we look for their practical help in raising the amount necessary for the proposed Common Room. Many old students have been very generous and we have collected about Rs. 9,000 already; we need Rs. 6,000 more. Could you give the enclosed papers

Yours Affectionately Zach

to your father and persuade him—I am sure he will need little persuasion—to help us as generously as is possible. If he sends a cheque, it should be made out in my name (not to the Principal) and crossed. We hope we shall have the pleasure of seeing him here during the Centenary celebrations towards the end of the year.

I am kept very busy or I should have come personally to enlist his support.

With good wishes to you.

[13]

Hooghly College
Chinsurah
20th Feby. 1936

I think I told you that I had written to your cousin and placed various alternative proposals before him in connexion with the Centenary Common Room. I haven't heard from him yet and I am writing to ask you to be good enough to sound him and find out whether he is thinking of helping us. We don't need the money at once—that can be paid by July or even August—but it will be a great help to know definitely what contribution he will make. If he is not prepared to meet the cost of a whole room—as I very much hope he will—then at least he can give us a smaller contribution in memory of his grandfather. I shall be grateful if you could use your powers of tactful persuasion on him and let me know the result. Do you think it will be helpful if I saw him? I shall gladly do so, if you advise it.

[14]

Hooghly College
Chinsurah
23.2.1936

Thank you for your very prompt reply. I am glad you are taking such a personal interest in the matter. I am most anxious that we should get all the money for the Common Room and I have myself seen scores of people and been offered sums from one rupee up ! I don't mind begging in this matter, because I am not begging for myself. However, I am sure I can safely leave your cousin to your gentle hints. I very much hope he will decide to give the Rs. 2000/- for the Reading Room : that would be a worthy and permanent memorial of his grandfather.

With regard to the dates—we have nearly all the old registers and this is the information we have already collected about your grand-uncle. The dates of his study in the college at any rate are accurate — the date of birth was calculated from the age he gave when he joined college and is only approximate. The entry at present stands thus :

> CHATTERJEE, Gopal Chandra, Rai Sahib. b. 1855. f. Kali Kamal Chatterjee. Garifa. Gya School/Hooghly College from 1873-75, I—III years; F.A. 1874 (1st division); scholar 73, 74/Presidency College, B.A. 1877 (1st division); L.C.E. 1880. P.W.D. 1887.

We shall be glad to have any corrections and any additional information.

Thank you for your help.

[15]

Hooghly College
Chinsurah
22.3.1936

Thank you for your letter of the 17th. I understand and sympathise with your feelings, your hopes and disappointments. But at the same time a wise man does not waste time on regrets, he tries to make the best of things as they are. And I think you are probably right in turning to law. If I can ever be of any help to you, in education, you may count on me—but, as you know, my help cannot go very far.

I am coming to Calcutta next Wednesday—and if I can manage it, I shall come round to your place about 11 or 11-30. Will you be in at that time ? But I am not at all sure I can manage it—so don't be disappointed if I don't appear.

Yours affectionately
K. Zachariah

Rabindranath

Amal Bhattacharji

Modern Bengali poetry developed much later than the prose. Poets before Tagore fail signally to create a language that should adequately communicate a direct

The late Prof. Amal Bhattacharji read this paper to a private gathering at Cambridge on the anniversary of Tagore's birth in 1967. He had practically no access to Tagore's works when he wrote it; this paper is best taken as a step towards a complete study that Prof. Bhattacharji had planned to make. We are extremely grateful to Mrs Sukumari Bhattacharji for allowing us to publish this paper.—Editor.

experience, however simple. As a result, their poetry as a whole makes an impression of total emptiness, although it is also wordy, full of exaggerated emotional gestures. The great Madhusudan Dutt is indeed an exception. But his achievements, splendid as it was, did not and could never make any lasting impact ; essentially it was remote from the genius of our language and from the entire tradition of our poetry. Tagore's poetry, after the period of youthful experiment, has an utter purity of language, a simple clarity, a melody entirely new. As he grows more mature, this is reflected in an increasing mastery over more and more complex modes of imagery and melody, expressing—as yet—purely emotional experiences but of a range and subtlety unexampled before.

Tagore's maturity was a process of continual readjustment to a world that never reached a final definition or delimitation of boundaries, slow, sometimes halting, always painful, with phases that are usually sharply marked. His sensibility was the product—never finished, it must be said, never reaching completion—as much of a very ancient culture which has once again come to life through an intense personal discipline, as of the new spiritual and intellectual forces to which he seldom refused to expose himself. It will be a mistake to say, although this is what is usually said, that he achieved a synthesis. The contradiction between the two is always there, felt by himself as well as by his readers ; it is the source of tension that prevents him from ever arriving at a final image of existence and resting there. And this results in an achievement that compasses an astonishing range of expression indeed : poetry, novel, drama, music, dance forms, painting, even practical activity of all sorts, all full of depth and richness and complexity. It was not that Tagore's genius was, as it is commonly expressed, "versatile". His sensibility, responsive to life in multifarious ways and always with the same alert quickness, demanded such multiple expression. And the same level of mastery shows itself in whatever medium he might be using for the moment.

There has been much controversy over the question of his debt to the West, and it is not likely to be settled soon. What should perhaps be realised is that it is not really a question of whether and how much he is indebted to the West. Our great epic poet Madhusudan may indeed be called its child. But one can analyse the strands of direct influence in him—he himself would proudly acknowledge them—as one cannot in Tagore, for they do not exist. In a sense, however, his relation to the West was deeper, consisting as it did in a certain subtle modification of the sensibility brought about by his adolescent experiences in England. His direct acquaintance with European culture was neither wide nor deep nor extended to its most vital or significant areas, but it was indeed unnecessary. His genius, strongly individualistic and rooted unshakably in its own inner foundations, could be aware only of those aspects that it could absorb and digest, in order to develop according to its own laws. We may say that his adolescent experience of the West had a certain shaping and directing force on his genius, which we cannot yet precisely analyse or determine. The important fact, however, is that besides England and little of Europe that he could know through England, tht Far East also supplied him with forms and material for creative assimilation. Tagore always scorned the eclecticism that goes with a shallow inspiration, his imaginative and spiritual convictions were passionate and stable without ever being petrified. So the correct thing would be to accept, realise and interpret him as simply himself. His foundations were derived from the Upani-

sadic culture transmitted to him by his father, who had recreated and reinterpreted it for his own spiritual needs. Naturally, Tagore's own needs would not be the same, and the foundations survived only through continual revision, reinterpretation and expansion, continual readjustment to drastically new situations. It involved a struggle that was magnificently heroic. That these foundations continued to survive and inspire him is a sign not perhaps of their intrinsic validity but of Tagore's own private need for them and his failure to discover, or the world's failure to supply, alternative foundations to replace them. Equally, the living world he could never deny. And inevitably, there came a period lasting for nearly twenty years when the discrepancy between this noble and beautiful and coherent inheritance and the chaos of the living world became so insistent that he had to renounce either the one or the other. He chose to retire into a private world of repetitive and tiresome mysticism, writing much on different themes and in different moods, but never before or after to so little purpose, with such mannered verbosity, making so many directionless metrical and linguistic experiments.

Just when, however, one might imagine that his creative power had exhausted itself, the most astonishing renewal occurred. A visit to Russia played a not inconspicuous part in this. The enthusiasm that overwhelmed him at first was succeeded by a more critical understanding, but the spiritual expansion and deepening remained. The process which now began culminated, at one level, in his public repudiation of the values of Western liberalism, to which he has been attached all his life ; at another and deeper level, in a re-exploration of his inner life, a restatement of its foundations in an image which surpassed, without denying, what he had inherited and preserved. The agony of the process can be best seen in the paintings, a new world which he discovered at about the same time and which has hardly received the attention it demands.

Never parochial in his outlook, Tagore could now find his place in what then was and still is humanity's most momentous struggle. Its end—fortunately for his poetry and for his art—he did not see in any specific economic or political constitution. For him it lay in a more and more radical assertion of man's spiritual core, of the basic values. There was not and could not be a break with the past ; only through the Upanisadic heritage could he articulate. In a very true sense he re-wrote himself. The extent and depth of this can be seen if we compare the Bengali Gitanjali, with its exquisite—sometimes merely exquisite—simplicity, and the poems he wrote in the last five years of his life. In these the reverberations are deeply, unbearably tragic, in the non-secular sense, for they spring from a conviction of man's power to overcome his own limitations, to achieve his own resurrection, as it were, through the stark virtues of integrity and courage. Physically and spiritually, in his last years he passed through the pain of death and hell ; there is no longer, as in the Gitanjali, the vision of achieved peace. But the same irradiation is there, the same assurance.

For us today, Tagore's poetry is a challenge, not to be merely assented to, or denied, but reassessed and reinterpreted. Will he remain valid for us in coming generations ? That will depend on how far he will be able to answer their deepest questions, in other words, how much of his achievement will be able to pass into the poetry of later times, when it is less directly affected by his powerful idiom. The heritage that Tagore has left us is too vital to be left to legendary fame.

The Statistics of Death

Atindra Mohan Goon

The philosopher asks us to remember that death is but a part of life and so to take it in our stride. The *Bhagavatgitā* says in the same vein: "Just as one would take on a new garment on throwing away an old and tattered one, so does the soul leave one body (in death) and enter another", implying that there is nothing surprising, nothing really to worry about in death. The poet goes a step further and writes: "Death, you are to me as dear as *Shyāma* is". Yet few people can take the death of their near and dear ones, or, for that matter, think of their own death, with equanimity. Indeed, most of us, ordinary people, feel overwhelmed with grief under bereavement. And the very thought of our own death may bring to us visions of all the dreadful diseases under the sun and of the still more dreadful life in hell!

To a statistician, however, death is just a number—to be added to one figure and deducted from another. A tendency to philosophize would hardly be considered a virtue in a statistician; nor should he be given to flights of poetic fancy. Nor should the poignancy that is associated with the death of a loved one find a place in the statistician's scheme of things. From a professional angle, his approach to death, as to anything else, has to be matter-of-fact, shorn of all emotions.

Most countries of the world now maintain registers of death (as well as registers of birth, marriage and migration) with the idea that every death should get recorded as and when it occurs, together with the age and occupation of the deceased, the cause of death, and so on. The system may be next to perfect, as in the UK, USA or USSR, rather defective, as in India (where the task of reporting deaths occurring in rural areas is still left to village *chowkidars*), or utterly unreliable, as in some countries of Africa. Some data on the deaths occurring during, say, the preceding one-year period may also be collected in the course of a population census, which need not be a mere counting of heads. There are, besides, the hospital records, that may provide us with rather detailed information on the deaths occurring in hospitals.

In spite of the varying quality of such data, certain broad conclusions regarding mortality—its trend and pattern—may be drawn from the great mass of data that are collected from death registers, census returns or hospital records. We shall present here some of the highlights of the story that is told by the statistics of death, a story that may be of interest not only to demographers and public health workers, but also to laymen.

Declining trend of mortality

The simplest measure of mortality, i.e. risk of dying, is the (crude) death rate,

which represents the average number of deaths per 1,000 people in the given community (say, a city, a State or a country) during the given period (say, a year). The following table shows the death rates for a number of periods for certain countries of the world.

If we look at this table, two features of the data immediately attract attention.

First, each of the countries under consideration shows a declining trend of mortality. Indeed, a decline in mortality has been an almost universal experience, reflecting world-wide progress in the sphere of health and hygiene. People are showing a greater awareness of the principles of hygiene and of the nutritive aspect of food and, by and large, are living in healthier surroundings. At the same time, certain recent advances in the field of medicine have made it possible to control diseases that were till the other day virtually incurable. The discovery of the sulpha drugs, the steroids and the antibiotics, in particular, has come as a veritable boon to the sick. Alongside this progress, the adoption of certain public health measures has contributed to the prevention of quite a few types of disease. From our own experience, we can say that malaria, that used to be a scourge until recently, taking a heavy toll of lives every year, has been virtually eradicated, thanks to the large-scale spraying of likely breeding grounds of mosquitoes with DDT.

Second, it is a fact that for most countries of Asia, Africa and Latin America, the level of mortality, though declining, has remained much higher than those of the countries of Europe, North America and even Japan. It may be said that generally the higher the level of economic development the lower is the level of mortality. Economically backward people cannot derive the maximum possible benefits that modern medical science offers. Malnutrition and unhealthy surroundings, illiteracy and an absence of proper medical care, that characterize the poorer countries, do not allow a more rapid reduction in the mortality level.

India's case is peculiar in some respects. The rather low rate of literacy notwithstanding, our educational standards are quite high and remarkable progress has been made in the various branches of science, including medical science. In consequence, almost every new medicine and almost every new mode of treatment are available within the country. Yet an effective system of public health, of sanitation in particular, is still a far cry. A large

TABLE 1: DEATH RATES FOR SELECTED COUNTRIES FOR A NUMBER OF PERIODS

Years	Australia	Japan	Ceylon	Egypt	England & Wales	Sweden	Canada	Guatemala
1868-1872	14.4	—	20.9	—	22.2	19.3	—	—
1878-1882	15.2	18.1	22.7	—	20.3	17.6	—	—
1888-1892	14.4	20.4	26.8	25.1	19.0	16.8	—	28.2
1898-1902	12.7	20.6	28.2	26.5	17.4	16.2	11.0	20.7
1908-1912	10.7	20.8	31.1	27.1	14.2	14.1	12.1	21.4
1918-1922	10.5	24.0	31.6	29.7	13.7	14.2	12.5	23.1
1928-1932	9.0	18.8	24.0	26.9	12.2	12.0	10.8	21.1
1938-1842	10.4	16.7	20.1	26.3	12.8	11.1	10.6	27.9
1948-1952	9.6	10.7	12.4	19.4	11.6	9.9	9.1	22.2
1956-1960	8.8	7.8	9.7	17.8	11.6	9.7	8.0	19.3

percentage of our people suffer from malnutrition, live amidst the most unhygienic surroundings and do not simply have the money to care for either preventive or curative medicine. It may thus be said that while we have the technical know-how to control diseases, widespread poverty prevents us from enjoying its full benefits, so that the death rate remained as high as 17.9 even in 1965-66, according to one estimate.

Changing pattern of mortality

A classification of deaths according to cause (type of disease or accident) offers a better insight into the trend of mortality. The following table presents such a classification and shows the death rate for each of the causes per 100,000 persons in the population. The percentage contribution of each cause to the total number of deaths is also shown alongside. The figures concern the years 1900 and 1960 for the USA, but the general trend may be supposed to be similar for other countries, too.

On comparing the figures for the two years, we first find that there has been a sharp decline in mortality between 1900 and 1960. Such a decline has occurred not only in overall mortality, but also in mortality from most of the specific causes—cardiovascular-renal diseases, diabetes mellitus and cancer being the notable exceptions. But what is more striking is that diseases that had been the major killers in 1900 became less significant in their impact in 1960, these being more amenable to

TABLE 2: MORTALITY FROM SELECTED CAUSES FOR USA IN 1900 AND 1960

Cause of death	1900		1960	
	Rate per 100,000 people	Percentage	Rate per 100,000 people	Percentage
All causes	1719.1	100.0	954.7	100.0
Tuberculosis	194.4	11.3	6.1	0.6
Influenza and pneumonia, except pneumonia of newborn ...	202.2	11.8	37.3	3.9
Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of newborn	142.7	8.3	4.4	0.5
Diphtheria	40.3	2.3	0.0	0.0
Typhoid fever	31.3	1.8	0.0	0.0
Major cardiovascular-renal diseases	345.2	20.1	521.8	54.7
Vascular lesions affecting central nervous system	106.9	6.2	108.0	11.3
Diseases of heart	142.7	8.3	369.0	38.7
Other hypertensive disease and general arteriosclerosis ...			27.1	2.8
Other diseases of circulatory system	14.7	0.9	11.0	1.2
Chronic and unspecified nephritis and other renal sclerosis	81.0	4.7	6.7	0.7
Cancer	164.0	3.7	149.2	15.6
Diabetes mellitus	11.0	0.6	16.7	1.8
Motor vehicle accidents	—	—	21.3	2.2
All other accidents	72.3	4.2	31.0	3.3
All other causes	615.7	35.8	166.9	17.5

modern medicine. To this category belong the childhood diseases, diseases of the digestive tract and those of the respiratory organs. On the other hand, diseases that were comparatively rare in earlier times have become more important in their contribution to total mortality. Such are the heart diseases, hypertension and other diseases of the circulatory system, diabetes mellitus and cancer, and also motor vehicle accidents. To take but one example, heart diseases accounted for only 8.3% of all deaths in 1900, whereas as many as 38.7% of all deaths in 1960 were due to diseases of this type. The upward trend of mortality from the second group of causes may in part be attributed to improved methods of diagnosis. It should also be noted that the cardiovascular-renal diseases (i.e. diseases of the heart, arteries and kidneys), diabetes mellitus and cancer are conditions that are most prevalent in midlife and later. As such, the rise in the death rates for these causes partly reflects the ageing of the population, i.e. the rising proportion of aged persons in it. But what is more important is that while medical science has been able, by and large, to provide cures for diseases in the former category, cures for diseases in the latter category are a long way off, the rapid pace of research notwithstanding. It is also conjectured that the pace of modern life and its strains and stresses have a causal bearing on the greater incidence of the latter types of disease.

Variation of mortality with age

Consider now the following table that gives for India, for the year 1969, the death rates (called the *specific* death rates) per 1,000 persons for different age-groups, separately for males and females, and also separately for the rural and the urban areas of the country.

TABLE 3: DEATH RATES (PER 1,000 PERSONS) SPECIFIC FOR AGE AND SEX AND ALSO PLACE OF DWELLING (RURAL/URBAN), FOR INDIA, 1969

Age-group	Rural		Urban	
	Male	Female	Male	Female
0-4	58.32	70.16	43.16	47.06
5-9	5.79	7.71	3.67	5.45
10-14	2.99	2.72	1.85	1.56
15-19	2.09	4.22	1.58	2.82
20-24	3.88	5.54	1.70	5.89
25-29	3.73	5.50	2.82	3.20
30-34	4.07	6.35	2.69	5.11
35-39	6.54	6.05	2.44	4.35
40-44	8.52	7.60	7.58	5.59
45-49	13.17	9.36	11.53	8.03
50-54	—	—	15.15	9.10
55-59	22.36	17.76	20.46	15.23
60+	71.21	66.48	63.49	56.76

The table illustrates, for one thing, the way mortality varies with age. The general nature of variation may be supposed to be the same for other countries as for India. Besides, it is the same for males as for females, and the same for the rural population as for the urban. In each case, the curve of mortality (i.e. of mortality as a function of age) would be U-shaped, rising at the two ends of the age-range and having a minimum in between. At the very early ages, especially during the first few weeks after birth, mortality remains very high. Thereafter, it drops sharply till it reaches the lowest level in the age-group 15-19 for males and the age-group 10-14 for females. From then on the curve of mortality again rises, gradually till age 49 or thereabouts and rather sharply thereafter. It is also apparent from the table that at ages 60 and over mortality becomes higher than in the age-group 0-4.

Mortality for males and for females

Perhaps the most interesting aspect of the story of mortality is the way mortality varies from males to females. Table 3

shows that for all age-groups in the earlier part of the age-range, except the age-group 10-14, for the rural population as well as the urban, the male rates are generally lower than the female rates, while the position is reversed in the later part. But the usual pattern of mortality variation with respect to sex, except in the economically backward countries of the world, is that for all age-groups—maybe with the sole exception of some years of life that form part of the female reproductive period—the male rates are higher than the female rates. So much so that the female of the species *homo sapiens* is considered biologically more viable than the male. This would belie the common notion that women are weaker than men—that the female of the species is a delicate creature to be treated with the utmost care. In view of this superiority of the female, Women's Lib would seem to be a lot of nonsense. On the contrary, it would appear that the Hindus of old who took for their deity of *shakti* a goddess, rather than a god, had a point!

To put it in a different way, the average longevity for males is generally lower than that for females. For instance, according to the level of mortality prevailing in England and Wales in the years 1965-67, the average longevity for males would be 68.7 years and that for females 74.9 years. (In the case of India, on the other hand, the corresponding figures for the years 1966-67 would be 53.2 and 51.9.)

A consequence of the higher viability or lower mortality for females may here be referred to. At birth, females are less numerous than males, the sex-ratio at birth in the case of India, for instance, being about 52 males to 48 females. However, owing to the relatively high mortality for males, with advancing age, the ratio gradually approaches the 50:50 form and, in fact, towards the end of the age-range females outnumber males.

Even when we consider individual causes of death, we find that women are generally better placed than men. Leave aside diseases that are peculiar to females. The following table relating to the USA would bear out the point that for quite a few causes that may affect both the sexes, the male rates are much higher than the female rates. Only in the case of diabetes mellitus is the female rate slightly higher.

TABLE 4: DEATH RATES PER 100,000 PERSONS FOR SELECTED CAUSES OF DEATH FOR USA, 1960

Cause of death	Male rate	Female rate
Influenza and pneumonia ...	35.0	21.8
Tuberculosis ...	8.2	2.9
Cirrhosis of liver ...	14.5	6.9
Diseases of the heart ...	325.5	205.7
Diabetes mellitus ...	12.0	15.0
Accidents ...	73.9	26.8

The higher rates for females at the earlier ages in the case of India and other economically backward countries may be explained in the following way : in spite of the privileges that women enjoy in the upper strata of the society, daughters are considered a liability and are neglected in poor families, which form a majority in such countries. Secondly, during the reproductive ages (say, the ages 15-49 last birthday) females undergo the additional risk of death from causes relating to childbirth, and this tends to make the female rates higher (even in the advanced countries) than what they would be otherwise. Take, together with these, the privations that women in poor families willingly suffer so that the men-folk may live in comparative comfort.

Geographic variation of mortality

Considerable differences in the level of mortality are sometimes found for different

parts of the same country. For instance, the level may differ markedly from one State to another, or from one city to another.

The following table relating to England and Wales, 1961, that gives separate death rates for five different types of locality will be of interest in this connexion.

TABLE 5: DEATH RATES FOR 5 TYPES OF LOCALITY FOR ENGLAND AND WALES, 1961

Type of locality	Death rate per 1,000
Conurbations	13.0
Urban areas with population of 100,000 and over ...	13.0
Urban areas with population of 50,000 and under 100,000	12.4
Urban areas with populations under 50,000	12.5
Rural districts	11.5

It would seem from these data that the higher the degree of urbanization the higher generally is the level of mortality.

The Indian situation, however, presents a different picture. Table 3 indicates that in India the death rates for rural areas are, as a rule, higher than those for urban areas—and this is true for all age-groups and also for both males and females.

True, people of Indian villages live in more natural, hence more pleasant, surroundings, breathe purer air and take purer food than people of towns and cities. But generally they ignore even the basic rules of hygiene; moreover, facilities for medical treatment are not as easily available to them as to people of urban areas. Hence the higher mortality for rural areas—and this is despite the spurious addition to the number of deaths in urban areas as a result of village-folk coming to city or town hospitals for treatment and dying there. The difference may also be partly explained in economic terms, as may be the difference in mortality between the developed and the undeveloped countries of the world. Village people being relatively poor, cannot afford to take proper care of health and hygiene or to avail themselves of the remedies that modern medicine is in a position to offer.

Mortality and marital status

The level of mortality is found to have a high degree of association with the marital status of people. In all countries the death rates for the married (married males as well as married females) at all ages from 20 upwards are found to be substantially lower than those for single, widowed or divorced persons. Also, these differences are more pronounced among males than among females.

These differences may be explained on the following lines : First, marriage is selective in the sense that young men or women of poor health are more likely to avoid marriage than those of good health because of the difficulties they may encounter in providing for, or in looking after, a family. Maybe, they are also less likely to be chosen as brides or bridegrooms ! As such, it may well be that a high proportion of people who remain single are of relatively poor health and hence have a higher death rate than those who marry. Second, the greater regularity of living among the married, especially married males, may have some importance in keeping their mortality at a comparatively low level. Third, it has also been suggested that marriage represents a better adaptation to life than does celibacy and so reduces mortality !

Let us now turn to the relatively high death rates of the widowed and the divorced. It may well be that these two groups contain a high proportion of people who made initial mistakes in the choice of mates, from the point of view of both

health and temperament. Second, the absence in the life of the widowed of the regularity to which they were accustomed in married life may tell upon their health. As regards the divorced, they have obviously been unable to make a satisfactory adjustment in marriage and this inability may be associated with physical deficiencies.

Mortality and occupation

We generally have some vague ideas about some occupations being more risky than others. Separate death rates for different occupation groups would give us a clearer picture. For obvious reasons, in such studies one restricts one's interest to the age-group 25-59 last birthday. The comparison of different occupations is made in terms of the standardized mortality ratio (SMR), which is 100 times the ratio of the recorded number of deaths in an occupation to the number to be expected in case the death rate for the total male population with work experience prevails in that occupation.

On the basis of their SMRs estimated in the course of a study of this type in the USA in 1960, we may arrange different occupations in the following order, from the least risky (from the viewpoint of mortality) to the most risky :

A. Clerical and kindred workers ; professional and kindred workers ; managers, officials, etc. (SMR between 83 and 86).
B. Sales workers ; craftsmen, foremen and kindred workers ; farmers and farm labourers ; operatives and kindred workers (SMR between 94 and 97).
C. Service workers ; labourers, except farm and mine labourers (SMR between 127 and 176).
D. Miners (very high SMR ; main contribution to mortality is from tuberculosis, there being on the average 263 deaths from this cause among miners for every 100 deaths from this cause among all males with work experience).

It may be said that, in general, the better-paid and the white-collar groups have the lowest death rates. Lower-paid and manual workers have higher death rates ; and as the economic status declines and hand labour becomes heavier and dirtier, death rates rise, except for farmers and farm labourers.

It would be worth while to conduct a study of this type in India, too. More interesting perhaps will be a comparison of the different professions in respect of mortality. For instance, are teachers subject to a higer level of mortality than engineers ? Or, more specifically, is the death rate for teachers of statistics higher than that for teachers of mathematics ?

Mortality and social class

We have already noted that economic condition has a significant bearing on the risk of death—that, as a rule, the higher the economic status of a country or group the lower is the level of mortality. However, a clearer picture emerges if we consider separately the death rates for different causes of death. Different causes of death are, in fact, found to have varying effect on people of different social classes.

It has been observed, for instance, that for the following diseases, the lower the social class—in other words, the less favourable the economic circumstances—the higher is the level of mortality :

Respiratory tuberculosis
Bronchitis
Pneumonia
Other myocardial degeneration
Ulcer of stomach
Cancer of stomach

On the other hand, the following causes appear to be associated with comparative affluence :

Acute poliomyelitis
Leukaemia
Coronary diseases, angina
Cirrhosis of liver
Diabetes mellitus
Vascular lesion of nervous system
Suicide

There are other diseases that form a third group, having no appreciable mortality variation with variation in social class, e.g. nephritis and nephrosis.

TABLE 6: INFANT MORTALITY RATES FOR SOME COUNTRIES FOR THE YEAR 1969

Country		IMR per 1,000 live births
Australia	...	18.3
Japan	...	15.0
India	...	139.0
UAR	...	117.0
Ghana	...	156.0
United Kingdom	...	18.8
Sweden	...	12.9
Canada	...	22.0
USA	...	21.2
Guatemala	...	89.0
Chile	...	100.0

High infant mortality in India

Before bringing this essay to a close, we should draw the reader's attention to a very sad aspect of the Indian mortality picture. This concerns infant mortality, i.e. mortality among children in the first year of age (or, in other words, at age 0 last birthday). The usual measure of this phenomenon is (because of the extreme unreliability of the age-specific death rate for age 0 last birthday owing to the usually serious under-enumeration of infants) the infant mortality rate (IMR), which is the number of deaths among infants per 1,000 live births during the given period. (say, a given year). The following table shows how India compares with some other countries of the world in this respect :

The IMR is considered to be the most sensitive of all measures of mortality. This means that with but slight improvements in the system of public health and hygiene or with but slightly greater medical care, the IMR can be reduced greatly, in comparison with other measures of mortality. The fact that India has as high an IMR as 139.0, as against an IMR of only 15.0 for Japan, indicates what a tremendous wastage of life—life that can well be saved with but slightly greater care on the part of the family and the nation, is involved in the present state of our society. It is believed that most of the diseases of childhood can be avoided if the mother gets proper care during the prenatal period and both mother and child during the postnatal. and this is well borne out by the extremely low IMRs for Sweden and Japan.

It may, of course, be argued that the already nagging population problem of India would be far more serious if there were a lower level of mortality, for in that case the gap between the level of fertility and that of mortality would be much wider. But this would be a perverse type of argument, totally lacking in the spirit of humanism that sustains world-wide efforts to check population growth. For if our concern is to have a small population so that each of its members can be provided with a decent level of living. then it should be equally our concern to take proper care of the newborn. Indeed, mortality of the aged is in a way unavoidable, but that of the young, especially of infants, is, in a large measure, an avoidable phenomenon. A truly humanistic approach dictates that greater attention be paid to the care of the mother and the newborn, at the same time intensifying our present efforts to check population growth through family-planning.

A Criticism of the Age

Supriya Das Gupta

Perhaps the order of the words needs changing. For the age of which I wish to speak is our age of criticism, and if we do not call it that now, it is what the neat prosperous critics of the next century will call it, when they look back on us with a reverent complacence which we shall by then have deserved. And perhaps after all this is not criticism but complaint : not balanced, detached and documented as criticism should be, but partial, prejudiced and unreasonable as a complaint always is.

There comes a time when men 'convert their labours to aspire to certain second prizes ; as to be a profound interpreter or commenter, to be a sharp champion or defender, to be a methodical compounder or abridger ; and so the patrimony of knowledge cometh to be sometimes improved, but seldom augmented.' As our age closes in upon us, it becomes increasingly clear that it is in such a time that we now live. Eliot says that there are no ages of criticism, but here is an age that looks very much like one. There can have been no other age when so much criticism was written—so much good criticism, and so much bad ; no age when criticism was so much read or its importance so overestimated. Consider the literary quarterlies, with their half-pennyworth of literature to their monstrous deal of commentary ; consider the reading-lists of our undergraduates, the conversation of our intellectuals, of our academic circles ; consider what an interminable tide of analysis and interpretation, explication and argument beats in upon all of us cornered and intimidated readers. How can we not call it an age of criticism? How shall we call it anything else ?

There are critics of art and music and theatre ; but it is the critics of literature who, curiously, are more equal than the others. With what anxious diligence are

they read, with what wasteful acrimony refuted ! So palpable is their presence all around us that the reader today seems constantly to be looking nervously over his shoulder, as though regarded by some hundred-eyed Argus. It is as if we, each one of us, had at some time woken up to find all the streams labelled, the mountains mapped, the winds classified, and scores of tendentious wasps buzzing hypnotically in our ears. Over all of us, 'serious readers', the readers the universities have trained, these critics have come to exercise an overwhelming and alarming influence. This age has seen much good criticism written—criticism that it is a pleasure to read, and which makes the reading of literature a pleasure—but this is not all. What should cause concern is that the greater proportion of all what is written seems to be meant, not for us, but for a closed circle of critics, scholars and commentators. Such criticism is not written for the sake of literature, or for the sake of those who read literature—it is written for its own sake. Autonomous and self-generative, it is founded upon, and imposes upon us, a false idea of the function of criticism and the importance of critics.

Criticism is intended to deepen our understanding and appreciation of literature : such a proposition seems self-evident and yet it no longer is so. Most modern critics seem not to be writing for any reader at all. Once critics wrote as well as they could in order to be read ; just as poets and novelists write as they must and as best they can ; but modern criticism has developed a style, a manner, that is almost unreadable. It is a curious kind of institutionalized language that defies description ; a language that seems determined to make us realize exactly how much of a machine for thinking with a book is. Such criticism is graceless, pompous, narrow, self-important, dull: and it is also astonishingly contemptuous of the common reader, the man who is actually trying to read the poem, say, that is being criticised. And he realizes, after looking at the analysis, that reading a poem is much too difficult a thing for an ordinary layman to attempt, and so he doesn't read it after all; he reads the criticism instead. Consider then what criticism saves us from ; what it saves us for — more criticism. It is thus that the first critical fallacy — that the reading or writing of criticism has an importance separate from the novels and poems and plays it is about — is forced upon us.

For us, now, the highest act of the superior intellectual has become the writing of criticism. Such men, we feel, are specialists in literature : specialists such as Milton or Pope, Wordsworth or Shelley could never hope to become. They tell us that they have reduced criticism to an exact science, just like, only better than, both physics and philosophy : and so formidable is their array of methods and styles, erudition and accomplishments that the mere writing of novels and poems seems by contrast an awkwardly naive, far less worthwhile activity. We are all — even the writers — struggling now to attain the incredible sophistication of the critic, longing for some heaven in which we shall all talk like Dr. Johnson's little fishes.

I knew a young intellectual at college, who once told me, with no apparent sense of sin, that he never read 'books', he only read criticism. Perhaps, in some already visible future, we shall all have reached this unfortunate young man's state of refinement. Then the critics will take us on conducted tours, give us *their* 'Hamlet', *their* 'Portrait of a Lady', *their* 'Gerontion'. Already there has descended upon us the fascinated immobility of Laocoön and his sons, staring at the serpents who are about to devour them. It now takes considerable effort sufficiently to emerge from this trance, to tell ourselves desperately that

criticism *is* after all secondary to the plays and poems it is about—although the critics don't seem to think so. In such moments as these, gazing through their mystical fog of words, one has the nightmare vision of having trespassed on a quite deliberate racket, a parasitic commerce of middlemen. But of course this isn't so : what has happened is just as much our fault as the critics'. What *does* fascinate us about this ceaseless nagging ? When did we start believing, as a cardinal law, that criticism, whether it is extolled or reviled, must be read ?

These days, most of us read less literature, and think less of writing literature. In our years at college, we read fewer and fewer novels and poems and plays and more and more critiques of novels and poems and plays. Imperceptibly the voice of the writer fades into the Method-torn, the School-tormented sea. If you now ask a university student, 'Have you read *Middlemarch* ?', he'll discuss Leavis with you : or if he doesn't happen to have read Leavis, or some preferably even more fashionable writer, he won't be able to say anything about it at all, even though he might have read the novel. We realize that this is not an age when people read or write ; it is an age when people criticize, and this is an entirely different thing. Nearly every kind of literary sensibility is now drawn into this infinite agitation of wit : we see fewer good writers, fewer failed writers, and more and more critics, all indistinguishable, all successful, each striving to be more obscure than the next. These are the gods of the literary quarterlies, these are our gods : they save us from bad literature, so that we may have more time to read the criticism that tells us how bad it is.

We know, naturally, that most poems and plays are clever, commonplace, facile and bad : so is most criticism, but we don't know this so surely, we can't tell. For so formidably armed is the modern critic, so perfect is his lifemanship, so vast is his index that you cannot casually destroy him as you can the defenceless poet. He knows so much—how can you call up the temerity to say, even if you know it to be the truth—'there's less in this than meets the eye' ?

We should realize that there are almost as few good critics as there are good writers : that it is the bad critics who fill most university chairs, write most book reviews, most critical articles, most books of criticism. They are recognizable by their ostentatious devotion to the currently 'in' writers, their contempt for those who are no longer the fashion, and their endeavour to be as difficult, as incomprehensible, and as novel as possible, as though each had resolved to produce some ideal amalgamation of *The Road to Xanadu* and *Seven Types of Ambiguity*. When confronted with such inspired dullness, how can you feel that these men care for literature, that they enjoy reading ? And they don't like you reading—they tell you that reading is hard work, not meant for those unfamiliar with current critical method. These readers advance on their prey like the armoured Stymphalian birds ; it is as if they had sold their souls for a card-index.

And it is the peculiarity of modern criticism that *any* theory, so long as it has the right references in it—like the Bible and Kierkegaard—is respectable, and the more outré, the better. Nobody will think the worse of you if you try to analyse *The Waste Land* in terms of a Tantric ritual ; try to write a play in the manner of Shaw, and nobody will forgive you, the critics will lift up their pens and stab you dead ; but write on *The Hamlet Trinity* : *Hamlet the Father, Hamlet the Son, and Hamlet the Holy Ghost*, and you will be called original and imaginative. And the scholars are no better; Rowse proving that

Shakespeare's Dark Lady is Emilia Lanier is not really different from the New Critic showing us how all of Conrad's work is based upon some philosophical system so obscure that no one has heard of it.

And how much of this is criticism of criticism, words about words about books ! There are critics who criticize the critics who criticize the critics who criticize the books. We are fascinated by what the good critics say about the bad critics, what the bad critics say about the worse critics. Think of the correspondence columns of the literary journals, how they seem every day to become more and more like an endless round of one-upmanship. I read somewhere that the reading and writing of criticism is necessary for literary maturity: but surely it would be unfortunate if we acquired so great a degree of literary maturity that we gave up reading literature?

There was once a professor of English at this College who used to tell his students, 'There are few works of criticism which can help you. There are many which can harm you.' We have failed to profit by his advice, failed to see how much criticism can harm us. And if we are to avoid being utterly destroyed by our age of criticism, we have to learn, at some time or other, what is good about criticism and what is bad about it.

The task of a critic is not after all an easy one. It demands that he should think of himself as nothing, and of the work of art as everything: that he should exercise a rare degree of honesty and a rare degree of humility. Eliot said that there was no critical method except being intelligent; and we should realize that methods and styles, the ability to quote Freud and Frazer, matter less than intelligence—and humanity. And of course this is not all; the possession of these human qualities can only be part of what is needed. If the critic has them, he may be able to help us with literature, but even then he may find it difficult. And although his endeavour must be to help the reader, he can assume no authority to do so beyond that which we recognize in him. For all the magnificence of his critical vestments, he must know himself to be, when confronted with the work of art, a fallible human being, a reader; a learned, sensitive, perceptive reader, but just a reader. He cannot be right all the time, he must know that he will often be wrong; but he must at all costs be honest, and he must always be conscious that literature is not his raw material, but that for which he exists. Knowing this, he will be strenghthened in his independence and humility as a critic, and if we know it of him, we too may come to literature with greater independence and humility.

What then shall we do with all our bad critics, indifferent critics, pseudo-critics; the critics who have fed on Shakespeare and found him Falstaff, a tun of flesh, meat to grow rich upon; the critics who have spent their lives on the Metaphysical poets, on Blake, on Conrad, on Henry James? It is pleasant of course to think of measures as drastic as those proposed by Gilbert Norwood for too many books; but this would be intemperate and unfair—after all it's the age we're complaining about, not just the critics. All we can ask of them is that they should recognize what should be obvious, that they are writing for readers of literature not of criticism. That they cannot really help the writer, for

> every attempt
> Is a wholly new start, and a different
> kind of failure.

And that, after all, the end of reading literature is joy; and it is this that the critic must help us to attain. Perhaps, then, we may read more literature and less criticism; and it will have been worth it even if we all fail as writers, rather than that we should all succeed as critics.

The Role of Death in *Antony and Cleopatra*

Shirshendu Chakrabarti

"he died
As one that had been studied in his death,
To throw away the dearest thing he ow'd,
As 'twere a careless trifle".

The manner in which the Thane of Cawdor dies in *Macbeth* throws light on the attitude towards death which, to my mind, is central to the meaning of the play *Antony and Cleopatra.* Of course, while the Thane is executed for treason, Antony and Cleopatra choose to die. But the kinship lies in the response of studied deliberation towards death in both cases. Such an attitude draws strength from Stoic philosophy and runs through the Roman plays of Shakespeare. This is a natural concomitant of the spiritual chastening of the tragic hero, and without the emphasis it acquires in the above plays, it is present in all great tragedies.

Suicide in these plays is far from being a reprehensible act. We are not in a world where the Everlasting has fixed his canon against self-slaughter, or where suicide is the working of divine retributive justice: Lady Macbeth, Malcolm tells us, "took off her life" "by self and violent hands". In *Antony and Cleopatra,* suicide is the affirmation of the invincible human will pitted against a tragic fate. Far from being the result of despair, it seems to be the only way out of it. It is only in death that Antony and Cleopatra triumph over the thwarting limitations of sublunary life.

All this is best understood against a philosophical background. Among all the Stoic philosophers, Seneca (whom Shakespeare read either directly or through Montaigne) was the only one to have a deep influence on the Elizabethan Age. Hardin Craig[1] points out three distinct theories of tragedy held together characteristically in the synchretist mode of Elizabethan drama: Greek, Stoical and Christian. According to the Greeks, human calamity is an irresistible and often inexplicable manifestation of divine order (*Oedipus*

Rex, Agamemnon). Christianity made man responsible for his actions: the tragic heroes became victims of divine justice in the wake of their sins (Dr Faustus, Macbeth). Contrary to both of these, Seneca believed that man's lot was inevitably bad, that calamity was irresistible, inescapable. Since man was sure to be beaten, Seneca proposed to build up a kind of Herculean or Promethean titanism *within* the heart of man which would enable him to gain a pyrrhic victory over fate. Thus, suicide, for Seneca, was the supreme act of human freedom. Incidentally, the stance of the earlier Stoics like Chrysippus, Zeno or even Cicero towards death and suicide was different, but a discussion of that falls outside the purview of this essay[2]. Although the *Antony and Cleopatra* universe may not be surcharged with evil, in so far as the play represents the struggle of two human beings for self-mastery in order to achieve philosophic calm, it is occupied with the Stoic view of life. I will, however, try to argue that the play goes beyond Stoic austerity and indifference: death reflects, even extends human attachment and becomes one with life.

II

Two ways of life have their battle-ground within Antony's soul. He constantly oscillates between the life of reason (Rome) and that of passion (Egypt). In the very first scene of the play we find that the worthy descendant of Hercules has degenerated almost beyond recognition: "The triple pillar of the world transform'd/Into a strumpet's fool". All the Romans in the play join in a chorus of censure mixed with pity, directed against Antony's licentious life in Egypt; instances can just be multiplied. Enobarbus hits the nail on the head when he detects the malady in Antony's soul: "Antony only, that would make his will/Lord of his reason". As a contrast, the earlier Antony is conjured up also in a chorus—this time one of praise—Caesar's extensive eulogy being perhaps the most glowing of the tributes.

But Antony has not really fallen. For, after his summary neglect of the messenger from Rome in I.i, in the very next scene we learn that "He was dispos'd to mirth; but on the sudden/A Roman thought hath struck him". He longs for delivery from the siege of contraries: "These strong Egyptian fetters I must break,/Or lose myself in dotage". There is a distinct note of defiance in his ordering the messenger to speak the naked truth: "mime not the general tongue". He even reveals an insight into the wiles of Cleopatra: "She is cunning past man's thought". Incidentally, this proves that Antony chooses to be fascinated by the Egyptian queen; there is just a hint of his rejection or sacrifice of inherited values for a new set of ideals. This, I hope, will be clear by the end of the essay. Antony startles us with his self-command when he silences the acid cynicism of Enobarbus in a remarkably controlled Roman speech. He displays a noble and dignified restraint in the scene of leave-taking from Cleopatra, in spite of all her provocations. In his lover's earnestness he fails to understand the raillery of Cleopatra: the implied sincerity of his love only serves to redeem his character from the Roman charges of being unmanned by the Circe-like influence of the Queen. Instead of the fleeting passion of his predecessors Julius Caesar and Pompey, Shakespeare gives us the genuine love of Antony.

For a while, all obstacles seem cleared up: Antony and Octavius are pledged in friendship especially through the former's marriage with Octavia. The forces of empire-building apparently subdue the claims of the rebellious individual. But as Enobarbus prophesies, and as Antony himself knows, he "will to his Egyptian dish again,"—his pleasure lies in the East.

Antony's oscillation between two attitudes towards life is not just a sign of inherent weakness of character, as it is so often made out to be. It represents a fuller response to the crisis in traditional values. In contrast to this, the cynicism of Enobarbus is facile and his tragedy (or pathetic ending) lies in his failure to take into account the power of the emotions within man. Caesar, of course, is not divided; but, then, in his shrewd efficiency he lacks the rich grandeur of Antony. He himself extols the nobility of his rival:

"The death of Antony
Is not a single doom : in the name lay
A moiety of the world."

One feels that Caesar is of the family of Fortinbras, related to the theme of success and performing the semi-choric role of restoring order at the end of tragedy.

Back in Egypt, Antony becomes enthralled to Cleopatra again : "so our leader's led, And we are women's men." He forfeits all his claim to valour and soldiership,—having lost command over his army and himself, he follows Cleopatra in flight from the battle. This is the nadir of his ignomony. But almost imperceptibly, the change has started taking place : "Things at the worst will cease, or else climb upward / To what they were before."

III

Antony has "resolv'd upon a course,/ Which has no need" of others. Adversities make him heroic and defiant : "Fortune knows,/We scorn her most, when most she offers blow." But he remains passion's slave ; his uncontrollable rage at Cleopatra's reception of Thidias (III. xiii) is ample proof of this :

"Have I my pillow left unpress'd in Rome,
Forborne the getting of a lawful race,
And by a gem of women, to be abus'd
By one that looks on feeders ?"

His blustering is the first feeble effort to reorganise the shreds of his being. He makes peace with Cleopatra almost at once as she professes her love in an exaggerated, artificial manner : "I am satisfied." The attitude of either lover here emphasizes what I have been trying to establish,—the uncertainty of human love in a very fluid stage of society. The framework of traditional values seems to have crumbled down, nothing is sure in this world. Thus, Cleopatra must employ rhetoric to convince Antony of her love, and he in his turn *must* believe her : the situation is pathetically human. Only death can brush away these cobwebs of doubt. We begin to detect a new titanic fortitude in Antony—death begins to lose its horrors for him : "I'll set my teeth,/And send to darkness all that stop me.... I'll make death love me." On the eve of the second battle his speech acquires an oracular intensity : he will "except victorious life,/Than death, and honour." We are instantly reminded of Brutus in a similar position : "I shall have glory by this losing day,/More than Octavius and Mark Antony/By this vile conquest shall attain unto." He has a redeeming eagerness for the fight with Octavius : "Eros ! mine armour, Eros !" The path towards stoical calm involves isolation : the God Hercules has left him, Enobarbus has deserted,—but Antony has become less bitter and agitated.

In the battle he is crowned with glory and seems to have recovered his identity. In the authentic vein of Senecan heroism, he sets up for himself almost impossible or superhuman tasks of endurance : "I would they'ld fight i' the fire, or i' the air,/We'ld fight there too." But the oscillations carry on between "hope and fear/Of what he has, and has not." The betrayal by Cleopatra implies total isolation for Antony, and we find him contemplating suicide : "And with those hands that grasp'd the heaviest club,/Subdue my

worthiest self." Beguiled "to the very heart of loss", Antony feels the unreality of his being, but offers the solution himself : "there is left us / Ourselves to end ourselves." The news of Cleopatra's death gives him a tragic serenity ; Antony suddenly rises far above the vulgar bustle of the everyday world. His weariness is a typical ingredient of the tragic experience. It is an indication of the philosophic reconciliation reached at the end of turmoil :

"do not please sharp fate
To grace it with your sorrows : bid that welcome
Which comes to punish us, and we punish it
Seeming to bear it lightly."

Notice how suicide becomes in the mind of Antony an act of love : "But I will be a bridegroom in my death, and run into't / As to a lover's bed." It is more than an act of individual freedom : it is activated by sympathy rather than isolation.

IV

Like Antony, Cleopatra also seems to have two images, the courtesan par excellence and the royal Queen bravely embracing death. As in the case of Antony, Cleopatra is something more than either. However, she is not constantly pulled between these contraries; there is a steady deepening of her response in the course of the play. Initially, she seems to be a prototype of Shakespeare's Cressida, constantly provoking and tantalizing. In the very first scene she urges Antony to attend the messengers on business. She repeatedly suggests that he has a uxorious nature ("Fulvia perchance is angry"), and that his blood is Caesar's homager, provoking Antony's outburst against the very foundations of the Roman Empire. His enthusiasm is duly undercut by the worldly wisdom, the experienced scepticism of Cleopatra (she has had two famous but fleeting lovers). In I. iii, she explains to Charmian her strategy of love :

"Char. In each thing give him way; cross him in nothing.
Cleo. Thou teachest like a fool— the way to lose him."

With charming flippancy she crosses him in everything : "How this Herculean Roman does become / The carriage of his chafe." But her emotional involvement with Antony is never really in doubt.

She is, then, not frivolous. However, her love at first seems to be only a kind of intense sensuality. In I.v., her dialogue with Mardian is full of sexual echoes. She gives a characteristic physical touch to the image of Antony on horseback : "O happy horse to bear the weight of Antony !" She herself echoes the food-imagery that surrounds her popular image of a siren. But the poetry of her sensuality rather disconcertingly suggests something beyond it :

"Think on me,
That am with Phoebus' amorous pinches black,
And wrinkled deep in time ?"

Of course, there is a self-pity, an indulgence in her love: "music, moody food/ Of us that trade in love". Also, she does not seem to have the maturity to face the reality unflinchingly. Note how she receives the Messenger's news (II.v.) and comforts herself with the description of Octavia which the Messenger evidently fits to her liking (III. iii.). Like Antony, she is distracted and pathetically human in love, she *needs* the love of the Roman. It is thus that Shakespeare strips all outward trappings of his heroes and heroines: they face death primarily as Everyman and Everywoman.

Cleopatra, the armourer of Antony's heart, helps him put on his armour to fight what she realises will be the last battle. The rhythm and imagery of her greeting of her

"man of men" back from the battlefield conjure up the fragile beauty of their love in a hostile world: "com'st thou smiling from/The world's great snare uncaught?" Yet, when Antony is infuriated at her betrayal, she acts instantly on her womanly, even coquettish impulse: "go tell him I have slain myself". But this is the last time she does so.

V

The primary enigma of Cleopatra's character lies in her freedom from cultural and ethical restraints that largely define human nature: "Age cannot wither her, nor custom stale/Her infinite variety". We remember that probably the most lavish description of her is given by Enobarbus, otherwise famous for his cynicism. Such Dionysian vindication of passion as opposed to Apollonian pattern has, however, the seed of tragedy.[3] Cleopatra's spiritual growth which astonishes us as she faces death, proceeds through the course of the play in a subterranean manner. The poetry (as we have seen) that runs through her otherwise sterile sensuality gives it a mystery that prepares us for her growth. From a toy of sensuality, she becomes in love the symbol of fertility: we remember that she is always associated with the Nile and its life-giving properties. By IV.xv., Cleopatra seems to have made up her mind about suicide,—note the force of her determination: "My resolution, and my hands, I'll trust;/None about Caesar". Death has become an inferior competitor, for it will be proud to take Cleopatra and her companions. So, "what's brave, what's noble,/ Let's do it after the high Roman fashion."

Her language, her imagery and tone change miraculously. As Antony is hauled up to the monument in which Cleopatra is hiding, she exclaims: "Here's sport indeed! How heavy weighs my lord!" This recalls II.v. 11-15:

"I will betray
Tawny-finn'd fishes, my bended hook shall pierce
Their slimy jaws; and as I draw them up,
I'll think them every one an Antony,
And say, 'Ah, ha! y'are caught".

The same image used thus in radically different ways, throws light on the tragic resolution of the game of love. Her oft-quoted poetic outburst at Antony's death alone is a glowing testimony to her tragic elevation :

"The crown o' th' earth doth melt. My lord!
O, wither'd is the garland of the war,
The soldier's pole is fall'n! Young boys and girls
Are level now with men. The odds is gone,
And there is nothing left remarkable
Beneath the visiting moon".

It is in this frame of mind that she renounces worldly pleasures: " 'tis paltry to be Caesar: /Not being Fortune, he's but Fortune's knave". What is death but "that thing that ends all other deeds,/Which shackles accidents, and bolts up change"? At the peak of the tragic experience she falls into a kind of reverie dreaming about her Antony in superhuman terms. Actuality, of which death is the most potent instrument, almost ceases to exist for her.

She dresses herself up like a queen, in her "best attires",—death is stripped of its rags and is transformed into a thing of beauty: "Give me my robe, put on my crown, I have/Immortal longings in me". This reminds us of Montaigne's view of Cato's suicide: "not spurred on by any hope of glory . . . but for the inherent beauty of the deed itself, which he who controlled its springs, saw much more clearly in all its perfection than we can".[4] The prospect of meeting her husband Antony transforms death into something eagerly coveted. Death becomes her lover: "The stroke of death is as a lover's pinch,/

Which hurts, and is desir'd". Note the physical touch of the image,—this is how the sensual and the spiritual harmonise in her nature at the point of death. She faces death now with philosophic calm, even tenderness:

"Peace, peace!
Dost thou not see my baby at my breast,
That sucks the nurse asleep?

VI

In tragedy, the inevitability of the scheme makes for tranquillity. Death for Antony and Cleopatra is inevitable, once they realise this, they make no attempt to escape. The consequent effect of calm ("Calm of mind all passion spent") can be traced back to the Aristotelian theory of catharsis. But, death has an additional role in *Antony and Cleopatra.* The core of the tragedy lies in the conflict between a synthetic order and the rebellious individual. The order upholds war, statecraft and imperial glory; and it is powerful enough to crush any opposition,—ironically, it is imposed upon man by man himself. The order is also corrupt, for the "noble" interests of the Empire serve only the selfish ambition of Octavius Caesar, and Ventidius (III.i.) exposes the undeserved, parasitic glory of the General of an army. Antony chooses to give up the life and ideals of the soldier, but his life and love are incomprehensible to the Romans. We are shown the birth of love in a society which does not know what it is like, and it is only death that holds the key to this love.

The world is decidedly a hostile presence in this play: it defeats individual endeavour. We have seen how even the lovers cannot trust each other completely. In such a world Senecan tenets seem to hold true: man can assert his human essence only through suicide. Like *Hamlet,* this play in its own way implies an inquiry into the validity of human existence, the fundamental query of Stoic philosophy. From this similarity we may justifiably pass on to Hamlet's final view of death:

"If it be now, 'tis not to come; if it be not to come, it will be now. If it be not now, yet will it come: the readiness is all".

But, surely, there is something more in this play. The unique note of exultation, the poetry, the "happy valiancy" of the style have been remarked upon. But the radical cause behind the exultation has not been emphasized. The suicide of Antony and Cleopatra outgrows the Stoic attitude of indifference to pain or pleasure. On a very simple level, this may be illustrated by comparing Cleopatra's lines after the death of Antony with Macbeth's famous soliloquy in V.v. (To-morrow, and to-morrow . . .). In the former, there is not only no weariness with life, but I would even say there is a note of joy. Death is not a sinister presence at all, it becomes a force of life. Suicide is transformed into an act of deep human love. The opposition between Rome and Egypt is resolved in a dialectical relationship, which mirrors even in the larger design of the play the main theme of love and human relationship amidst strife. The violent contraries of life and death so characteristic of Shakespearean tragedy, no longer cancel each other out in this play. With possibly only *Coriolanus* in between, Shakespeare passes on from *Antony and Cleopatra* quite naturally to the larger synthesis of the Last Plays, particularly *The Tempest.*

NOTES

1 Craig, Hardin: *The Shackling of Accidents: A Study of Elizabethan Tragedy,* included in *Elizabethan Drama,* ed. R. J. Kaufmann (London, 1961).

2 Rist, J. M.: "Suicide": *Stoic Philosophy* (Cambridge, 1969), pp. 233-255.

3 Stewart, J. I. M.: "Professor Schücking's Fatal Cleopatra", Ch. IV, pp. 59-78, *Character and Motive in Shakespeare* (London, 1949).

4 Montaigne: "On Cruelty"—*Essays* II xi, p. 177 in Cohen's translation (Penguin Classics).

Science : Illusion and Reality

Sumit Ranjan Das

This article intends to examine a few of what may be called the illusions in science. I should first explain what I mean by the phrase "illusions in science", by describing briefly the illusions we are going to examine.

One of these illusions arises from the general misconception regarding what science is about. Any attempt to define science is bound to fail tragically for any such definition presupposes that science is a static, unchanging system. Science has changed so considerably in the course of its emergence and development that any definition of science is bound to be inadequate. In fact, the definition of any dynamic system involves the formulation of a kind of locus or trajectory. The only plausible way of indicating what science is about is by viewing it as a complex of human activities: first, as a method of cognising nature; secondly, as a method or technique of mas-

tering nature, and thirdly, as a cumulative tradition of knowledge.

In all these three aspects, science turns out to be essentially an acquirement and application of knowledge about nature, or outer reality. As a result of the interaction between the material world and his senses each individual creates what may be called his private perceptual world. Now, these numerous private perceptual worlds are not exclusive and independent of each other. On the contrary, there are elements common to all the private worlds, constituting the so-called "common" perceptual world. What we term truth is but this "common" perceptual world.

Man, however, learns about reality by changing reality, an idea expressed in Heisenberg's Indeterminacy Principle.[1] Through the medium of language there is a constant change in the private perceptual worlds for man learns by changing his own perceptual world. Consequently, truth, or the common perceptual world is constantly altered. This is one of the several reasons why truth can never be "absolute". Truth thus acquires a dynamic character and accordingly, science, which deals with truth, is also a dynamic system.

Another of these illusions stems from the dominant idea that the ideas and theories of science are independent of the social milieu in which they are formulated. This idea is, however, a derivative of a more general idea that science, dealing with "objective" truth, cannot be a function of social factors. Nor can scientific theories depend upon the scientists who propound them.

Somewhat linked with this illusion is the doctrine of "Science for Science's sake". Science is regarded by the advocates of this doctrine solely as the product of the inherent human desire to know the world, as a result of man's endless pursuit after knowledge for its own sake. Thus science can be explained and understood totally and perfectly in terms of science itself—a misconception prevalent amongst many educationists.

The present article tries to examine these illusions. As shown above, science is essentially a dynamic system, an evolving process. Hence any correct analysis of the real nature of science inevitably involves a study of science in motion, of science in its perpetual process of "coming into being" and passing away, of "Science in History".

Man is a product of organic evolution from the apes and the transition from ape to man was accomplished by labour.[2] It is beyond doubt that primitive man intentionally changed his environment to meet the needs of food and shelter. This indubitably involved a mastery over nature which finds its earliest manifestation in the production of tools. Whether animals made tools or not is a completely different question.[3] This production of tools necessitated a knowledge of the basic properties of matter, and this rudimentary knowledge can be regarded as the foundation of physical science. The technique of production, on the other hand, gave birth to technology.

One can therefore conclude that science originated in the need for food and shelter, and not in man's purposeless drive in pursuit of "pure" knowledge. Nor is the knowledge derived from science used entirely to satisfy man's curiosity for, as has been conclusively proved by archaeologists, any knowledge was used immediately for practical purposes. Accordingly, from its very origin, science had a practical function.[4]

Material production, the basis of human life, essentially involves a *struggle* with nature, and science too thus becomes a product of this struggle. The struggle with nature cannot be conducted by a single individual ; therefore, men combined into societies, and entered into relations with

each other. Consequently, man's struggle with nature, and hence science, assumes a *social* character.

Man, accordingly, becomes essentially a social being. The genes in the body cells only contain a pattern, only convey a message, which can be transformed into growth by active interaction with environment. The man or the genotype, as he is born, is only a brute. This is borne out further by the fact that men have few instincts and the entire matrix of human culture mainly consists of acquired behaviour and thought patterns transferred from generation to generation by the process of social tradition.[5]

This social character of science is ignored by a large number of scientists and scholars, and this leads to confusion. As science is a social phenomenon, scientific theories, methods and techniques are dependent on, influenced by and determined by social factors. This provides a key to the understanding of the basic nature of science and such an understanding involves a brief survey of the history of science.

In the following account of the history of science, a special stress has been laid upon physical science. This does not, mean that physical science can be segregated from the other branches of science. Nor does this mean that physical science is the only "real" science. The choice of physical science has been dictated by the fact that all other branches of science follow a course of development almost similar to that of physical sciences. At any rate, all other aspects of science tend to acquire the character of physical science.[6] Accordingly, for the present analysis, the aspect of science which can be most profitably used for analysis is physical science. The conclusions drawn from the study of the history of physical science do not belong to the domain of physics alone ; they are equally valid for all other branches of science and are perfectly general.

III

The earliest of the sciences can be traced back to the growth of civilisation following the development of agriculture. The growth of cities and towns in the Bronze Age, based on agriculture and metal-industry, necessitated centralisation and this accounted for the growth of central grain stores. The management of these central stores demanded an efficient system of accountancy, and hence computing. It is this need that gave birth to the system of numerals and, as a handmaiden to it, arithmetic. The Babylonian numeral system was developed by about 2000 B.C.[7] The need for the maintenance of regular records also gave birth to an efficient calender which was, in turn, responsible for the growth and development of astronomy in Babylon, India and China.

The first great scientific activity took place in the Iron Age, in Greece and Ionia. The Greek society was based upon the system of slavery. Slaves were used, from the time of the early civilisations, not only for private purposes but also for production ; and the ruling classes, the slave-owners, were completely isolated from the main mechanism of production. This inevitably resulted in a separation in science and technique, and hence a cleavage of theory and practice took place. In the early stages, this separation was not complete, and not intense in form ; accordingly, the essentially materialist doctrines of Thales become explicable. The equalitarianism amongst the Greek ruling class invoked philosophers coming from the section of slave-owners (or, at least those who belonged culturally to the ruling classes) to challenge any new hypothesis and this spirit of challenge, argument and scrutiny gave birth to the deductive method. The resultant Ionian philosophy and science, expounded by Anaximander, Thales and Empedocles viewed the world as a dynamic, material process.[7a]

Meanwhile, the deductive logic of Ionian science wedded to the Babylonian numeral system resulted in Pythagorean mysticism. Pythagorean mathematics, which regarded pure numbers as the key to understand the world contained the embryos of two conflicting branches of thought, and thus contained an antagonism in itself. On the one hand, Pythagorean mathematics forms the root of the assumption of modern science that all things in nature are expressible in terms of numbers. On the other hand, Pythagorean mysticism served as the origin of future Greek idealism.

The isolation of science from technique, and the corresponding cleavage of subject and object, theory and practice were manifested in the speculative thought of Greek idealist philosophers. Parmenides expounded a static, unchanging world, cognisable only by pure speculation. This view was dialectically opposed by the school of Democritus which regarded the world as a collection of numerous atoms moving in the void.

Among later Greek philosophers, both Socrates' myriad of unchanging morals and truth, and Plato's rigid and unalterable class-differentiation system are attempts to justify the existing class order. Aristotle, on the other hand, can be regarded (so far as his science is concerned) as a partial return to Ionian thought.[8] He gave some importance to observation, though he himself conducted no experiments. Aristotle's theory of the "final Causes" is but a glib way of explaining everything by postulating an appropriate end for it. Aristotle fixed some "natural places" for all things, and motion towards these natural places required no force, while other types of motion required an external agent. Aristotle's classification of animals in order of superiority only justifies and perpetuates the existing class system, and thus essentially reflects the ruling class ideology.

Meanwhile, Alexander's conquests provided enough money for science and gave birth to brisk scientific activity, the Hellenistic Revival. The needs of architecture gave geometry a priority and the result was Euclid. Ptolemy's astronomy, based on the artistic love of geometric symmetry, ascribed a high place in the universe to man. Towards the later part of the period, Hellenistic empires disintegrated under the pressure of Romans, and this ushered in a socio-political change. This change was reflected duly in science, which recorded a significant and marked shift towards experimentation. The product of this shift was the materialist science of Archimedes, Aristarchus, Hipparchus, and Lucretius.

During the Middle Ages there were sporadic scientific activities in India and Arabia, but nothing comparable to the achievement of Greek science in spirit and content. The next great period of scientific importance is associated with the Renaissance and the birth of capitalism. The post-Renaissance period witnessed indeed a Scientific Revolution.

The basic thought behind the newly growing bourgeois culture was the concept of freedom of the individual, of human rights. Capitalism evolved out of feudalism as a result of inherent contradictions in the latter system, and gradually gained dominance all over Europe. In the field of human thought also there was a spirit of free enquiry into nature and its laws; and it is this spirit that bred what we term modern science.

Production for profit was the motive force of capitalism. This involved a significant improvement in technique, which, in turn, produced the need for scientific advance. The all-important rôle played by technology gave the craftsman enough respect, resulting in a partial fusion of theory and practice, laying the foundation of modern experimental science.

Capitalism, from its early days, was expansive in nature. The desire to capture foreign markets initiated the great voyages. Navigation necessitated the development of subjects close to it: astronomy, geography and magnetism. Accordingly, it is not an accident that the first great revolution in modern science was the Copernican Revolution, an astronomical revolution.

The demolition of all feudal ideas and their replacement by bourgeois concepts were reflected in science as a concerted war on Aristotelianism. The Copernican system, in its first years, found no evidence from observation. The basis of the Copernican system was in the metaphysical ideas of the rising bourgeoisie and in the strong urge to dethrone Aristotle. The Copernican system was placed on a firm footing by the experimental (observational) works of Tycho Brahe, and the Laws of John Kepler. Meanwhile, the practical need of spectacle-making initiated the study of optics, and the telescope was invented. That its invention was overdue is proved by the fact that it was immediately used by Galileo to provide the Copernican system a still stronger ground.

To explain how the Copernican system could exist, it was essential to study the free motion of bodies, and it is this need that gave birth to Galilean dynamics.

The newly developed scientific method, based on experimentation, found its advocate in Francis Bacon. Bacon's method, which took observation as the starting point of any study of knowledge, was opposed by the Deductive Method of Descartes.

The essential similarity of Galileo's laws of Dynamics (particularly, the laws of falling bodies) and Kepler's Laws of Planetary motion suggested that they can be fused into a single general theory. The need for this theory was satisfied by Newtonian Mechanics and Gravitation. An efficient study of dynamics required perfection of mathematical methods, and formulation of new ones, and the result was the invention of the calculus by Newton and Leibnitz.

During its birth, modern science, in its fight with the established paradigm, had to fight religion, which is always used to justify the established order. By Newton's time, however, capitalism was already dominant, particularly in England, and the bourgeois order was already beginning to lose its tremendous revolutionary character. This is reflected in Newtonian science as a partial compromise between religion and science. In Newton's world, God did not interfere with the movement of the world, but controlled everything from above, and also provided the 'initial' impulse in the name of force. God was, therefore, relegated to the position of a constitutional monarch, like the King in Newtonian England, following the Cromwellian revolution.

The steady spread of capitalist control all over the world and the tremendous increase of world market made possible by colonialism, created the demand of commodities and necessitated technical development; and this need was responsible for the outbreak of the Industrial Revolution. During the Industrial Revolution, the aspect of science as a technique came to the forefront. Science was consciously applied to the production of machines, and utilitarian science gained power. Through its applications, science effected social transformations, just as in earlier periods social revolutions bred scientific achievements.

The social effects of science contributed immensely to the wave of socio-economic revolutions all over Europe, all resulting in the establishment of complete capitalist control. It is in the midst of this vortex that the Darwinian revolution appeared in Biology. The revolutionary atmosphere in nineteenth-century Europe introduced the idea of change in the minds of the philosophers. This idea of "change" is the root

of the idea of evolution in biology (Lamarck, Darwin) and society (Marx). The revolutionary atmosphere also brought science and religion to a direct conflict, culminating in Darwin. Darwin's hypothesis of the evolution of higher species from lower forms and his explanation of evolution by natural selection hammered the last nail in the coffin of religion. Darwin's theory of natural selection by which the "fittest" survive, was derived from the bourgeois ideas of the "freemarket" where the "fittest" win. In fact, Darwin's theory justified the bourgeois system in which each individual had to "struggle for existence".

All the later achievements of physics and biology in the nineteenth century—Maxwell's Electromagnetism, Thermodynamics, Optics, Atomic Theory, Pasteur's Medical science, to name a very few—were all contained in the broad ideological structure corresponding to Newtonian physics. Newton was the supreme monarch in science just as the bourgeoisie was in society, and this state of affairs continued till the fag end of the nineteenth century and the dawn of the twentieth century.

The greatest outburst of scientific activity in the entire human history, however, took place in our own century. Towards the end of the nineteenth century, science, which grew under the protection of capitalism, itself effected a development of the capitalist economy, resulting in monopoly capitalism. This development, however, itself ushered in contradictions within the system, and a new social force, the proletariat, began to challenge the dominance of the bourgeoisie. The entire capitalist economy was being opposed by a growing and progressive socialist economy. As a consequence of the tremendous socio-political revolutions that took place, culminating in the Russian Revolution of 1917, the entire structure and content of classical (eighteenth and nineteenth century) science underwent a radical change, a change which can be called a second Scientific Revolution.

Towards the end of the nineteenth century, the discovery of Cathode Rays and X-Rays opened up new fields of study in physics. The practical use of the Cathode Ray tubes initiated a further study in the field, and the result was the discovery of the electron. Becquerel's discovery of Radioactivity was another significant advance. These new discoveries found immediate applications both in science and society. While all these experimental advances were made, there took place tremendous revolutions in the theory of Physics, the Quantum Revolution and the Relativistic Revolution.

Both Quantum Mechanics and Relativity shattered the framework of Newtonian Physics. The Newtonian system essentially involved a unidirectional subject-object relation which arose as a result of the one-way property relation of the bourgeoisie and the machine.[9] In the Newtonian system one can observe any object without disturbing it. Relativity of Einstein proved that measurements of space and time depend upon the frame of reference of the observer, and that the mathematical world of Euclidean geometry does not conform with the real world. Quantum Mechanics, proving the inefficiency of Newtonian mechanics and Maxwell's Electrodynamics to explain atomic phenomena, arose out of the need for a theory to account for several observations which were recorded as a result of researches in the microscopic domain. Heisenberg's Uncertainty Principle asserted that the very act of observation of any object changes the object, thus implying a two-way subject-object relation. This idea of the uncertainty that exists owing to this change of reality itself, gave birth to Wave Mechanics of Schrödinger and Dirac. The Quantum Revolution demolished Newtonian concepts, but it gave birth to another extremist trend—the concept of total inde-

terminism as a law of nature, propounded by Jeans, Schrodinger and others. This extremism, as a minute analysis reveals, is a reflection of the idea of uncertainty prevalent amongst the bourgeosie, arising out of the apparently inexplicable rises and fall in the world market. This extremism pushed science towards religion, through the mystical ideas of the "free will" which were claimed to be derivatives from the Quantum Theory. The religious reaction in modern science can be easily understood in the context of the fact that all these theories are attempts to justify and perpetuate the decaying capitalist economy and prevent it from being totally annihilated by the rising socialist forces.

The twentieth century marked a radical change in the nature and content of science. Following Rutherford's discovery of the nucleus, and assisted by the methods of Quantum Mechanics, came the growth of the branch of Nuclear Physics. The prospect of an enormous supply of power from a relatively small mass initiated research in Nuclear Physics. The result was however dangerous. Though Nuclear researches have succeeded in using Nuclear Energy for constructive purposes, particularly in the USSR, the major portion of research was directed towards the production of nuclear weapons. Science, which grew to aid mankind, has now turned out to be an agent for the total destruction of humanity. From the time of the world wars, most capitalist countries, like U.S.A. possess a war-oriented economy. In such an economy, the production of weapons is primary. This is why in most capitalist countries, most scientific research is defence-oriented. The huge practical applications of electronics have resulted in significant strides in the fields of electronics and solid state physics.

While the state of science in the capitalist countries seems to be dismal, there has been a significant progress in the socialist sector. The degree of this progress cannot be measured by quantitative rules .In socialist countries, the very nature of science has changed. Science is used in a planned way for the benefit of a vast majority of the people, and not of an insignificant minority. It is to be noted, however, that in spite of this significant progress, the socialist sector has failed to satisfy the burning needs of modern science.

IV

The first significant fact revealed by the foregoing analysis of the general stream of scientific development is expressed in D. D. Kosambi's famous statement : "Science is the cognition of necessity". We have seen how science is basically a product of man's struggle with nature, a result of the necessity of procurement of food and shelter. This is precisely the reason why science grew as a handmaiden to the techniques of production. Different branches of science arose in different periods of history at different places not as results of accidental circumstances. The history of science, like the history of any other branch of human activity, is not a chronological agglomeration of accidents admitting of no explanation. On the contrary, the story of the growth and development of science proves beyond doubt that the driving force behind all science has been necessity, both in the past and at present, and there is every probability that the same will hold in the future.

The immediate question that arises is : what is the nature of the necessity driving science ? The answer, as we have seen, lies in the interaction of science and society. As already pointed out (see Section II), science is essentially a social product and the necessity that motivates science is essentially a *social* necessity, the necessity of economic production. Since the needs of society are different in different stages of social evolution, it is obvious that the

methods, theories and techniques of science differ at different times.

Another kind of necessity which governs and controls science is what may be termed the "inner necessity" of science. This "inner necessity" is, by no means something different from and independent of the more general category of social necessity. The inner necessity corresponds to the needs of science itself. For example, Newton's law of gravitation was the result of a long felt need for a kind of synthesis which would explain both Galileo's dynamics and Kepler's astronomy. Similarly, Quantum Mechanics arose as a result of the need to explain atomic phenomena. In general, new scientific theories appear when the satisfaction of such needs become imperative.

The scientific method of modern times, as Russell writes, has three main stages :[10]

"The first consists of observing significant facts, the second, in arriving at a hypothesis which, if true, would account for these facts ; the third, in deducing from this hypothesis consequences which can be tested by observation".

The vital question which can be posed in regard to this extract is the implication of the term "significant". A study of history reveals that there does not exist any absolute and unchanging measure of the "significance" of facts in relation to science. In fact, this "significance" is time-variant, as proved by the fact that different subjects get priority at different times. The criterion of this "priority" and significance is, as we have already seen, social necessity.

It would be, however, erroneous to regard science simply as a kind of beneficial agent commissioned to satisfy the needs of *all* men. The division of labour necessitated the division of society into economic classes and in the successive social formations, different classes became the rulers. Science has always grown so as to be of immediate advantage to the ruling classes, often to the detriment of the others. The benefits gained by the suppressed classes were always incidental.[11]

It is a common idea amongst the scientists of our age that the theories of science are logical deductions from experimental evidence and that these theories arise solely out of observation and nothing else. This is an illusion. The very 'logic' of science is not an absolute entity, but a changing and relative one. As shown in the study of the history of science scientific theories, laws and hypotheses in general reflect the ideology of the ruling class of the time. (There are, however, some exceptions to this rule. In some periods of history science reflects the ideology of the suppressed classes ; but all such periods coincide with those of social transformation and revolution. In such periods two equally strong ideologies co-exist, not in peace, but in a state of conflict. This point will be made clear later). This is due to the fact that human beings acquire particular thought patterns from their respective environments. Consequently, a scientist as an active member of society possesses a definite mode of thought, a mode moulded and conditioned by the class he belongs to. When the scientist applies his powers of thinking to the study of nature, seldom can he escape from the limits set up by his social restrictions. Accordingly, his science becomes only an application of his class ideology to the study of nature.[12] As in a particular class society, science is practised mainly by the ruling class, the science of a particular period reflects the ruling class ideology. The fact that scientific ideas are derived from more general prevalent ideas of the time finds its manifestation in almost every scientific theory, many of which have been analysed in this article. Science, therefore, becomes a part of ideology in general, and assumes a class character.

The class character of science explains yet another fact. The diversity of the various theories can be grouped into seve-

ral broad sets. The different theories and laws of each set all contribute to the formulation of a working model of the universe; in other words, these theories fall under a huge paradigm. The paradigm is transmitted from generation to generation by the process of scientific tradition, and for the working scientists this provides a kind of commitment.[13]

The paradigms we are talking about are but the vast superstructure of class ideologies. At any period of time, several paradigms exist parallel to each other, corresponding to the several classes practising science. As noted before, the science of the ruling class proves to be the dominant one, and the paradigm of the ruling class forms the dominant system. The whole of Greek science may be said to fall under the huge Aristotelian paradigm which basically reflected the ideology of the slave owners, though this paradigm was feebly opposed by an antagonistic system of thought. The science between the Renaissance and the Quantum Revolution was based on the bourgeois ideology. The Quantum Revolution, coupled with the Relativistic Revolution, gave birth to two different and self-contradicting paradigms and this is due to the parallel existence of two equally strong economies—socialism and capitalism, and consequently two ruling classes.

From the class content of the paradigms of science it is clear that so long as a particular social formation persists, the corresponding paradigm persists. The scientists always try to retain their own paradigms and to fit natural observations into their paradigm. Consequently, as Kuhn notes, "the task of a scientist is to apply his paradigm and to bring it closer to nature".[14] It is, therefore, clear that normal science, instead of promoting change, resists any change in concepts.

A paradigm is not necessarily based upon reason and logic, and prompted by experimentation (in the case of modern science); and it can be safely said that the boast of scientists regarding science's rejection of authority is only an illusion. As any analysis of the history of science reveals, the paradigms upon which science is based are drawn from general ideological superstructure of a particular class, partly verifiable, partly mythical and mystical where verifications are delusive or altogether missing. In this sense, science is reduced to nothing but a system of prejudices of a particular class.

The great scientific revolutions essentially consist of the shattering of the existing paradigm and its replacement by a new one. As a paradigm is essentially based on a particular class ideology, such a revolution can take place when a growing class with its own paradigm has acquired enough power to overthrow the ruling class and, hence the dominant paradigm. Thus, it is expected that scientific revolutions can take place only in the process of a general socio-economic revolution. This is exactly what we find in the history of science. Therefore, the coincidence of the Renaissance with the bourgeois revolution and the Quantum and Relativistic Revolutions with the Proletarian Revolution are not accidents.

With a scientific revolution, and consequently with the shift of the paradigm, the corresponding "significant facts" also change and so, new fields of enquiry are set up. This explains why different subjects get priority at different times, and why the science in the socialist countries today is basically different from the science in the capitalist countries, both in methods of cognition and application.

The scientific revolutions do not, however, descend from a vacuum, nor new paradigms from nothingness. The ideas of the new paradigms are, in fact, bred in the older ones. Any paradigm contains a dialectical antagonism within itself from its very embryonic stage. On the one hand,

the paradigm tends to retain itself. On the other hand, however, scientific technique created by the paradigm, through its manifold effects on society, gives rise to new problems. The paradigm always tries to tackle such problems, but finally a stage comes when the conformity and the unstable equilibrium tends to break down. The scientific techniques, by social transformations, coupled with other economic causes, give birth to new social forces and hence new paradigms. The new paradigm, with the new social class, forces its way in and finds itself in direct conflict with the existing paradigm. In the struggle that follows, either the growing paradigm wins, resulting in a scientific revolution, or the dominant paradigm succeeds in supressing the "rebellion", resulting in an at least temporary destruction of the new system of ideas, which perhaps comes to power later. This dialectical story of science's development is found to be manifested in the Copernican Revolution, in the Darwinian Revolution and more clearly, in the Quantum Revolution.

Thus, in a sense, the history of science presents a picture of continuity with occasional leaps or violent revolutions, where the successive paradigms are born in the womb of the preceding ones.

We have just experienced one of the greatest scientific revolutions of history. Newtonian Mechanics has been dethroned no doubt, but the replacement by Quantum Mechanics and Relativity is only partial. Problems still remain unsolved. At an earlier stage, both Quantum Mechanics and Relativity seemed to be the "final" truth about nature. Recent researches have, however, revealed that something has gone wrong. It seems that the burning problems cannot be solved by modifications and alterations within the framework of the Quantum Mechanical paradigm. What is needed is but another Scientific Revolution which inevitably involves a complete demolition of the Quantum Mechanical system. There is also a similar situation in Biology. The question of the origin of man, together with the question whether life can be at all expressed in terms of numbers is one of the enigmas of the modern age.

Thus we have seen that science is not, and cannot be the mere purposeless pursuit of the curious man in search of "pure" knowledge and absolute "truth". Nor is science for the sake of science. On the contrary, our analysis suggests that science is a social phenomenon, piloted by social necessity, that scientific theories are conditioned by social environment. This realisation that science, like everything else, has a social and hence class character contributes overwhelmingly to the liberation of reality from illusion.

NOTES

1 According to Heisenberg's Indeterminacy Principle, the measurement of any physical quantity involves a disturbance of the conditions and a change in the quantity itself. Accordingly, the error in measurement cannot be reduced to a value smaller than a certain minimum.

2 Frederick Engels: "The Part played by Labour in the transition from ape to man." Marx & Engels: *Selected Works*, Volume 3, Moscow, 1970, p. 66.

3 Some archaeologists hold that man cannot be defined in the traditional way as a "tool-making" animal. See S. R. Das: "Stone Tools: History and Origins" (Calcutta, 1969), Preface.

4 V. Gordon Childe: *Society and Knowledge*, (London, 1956).

5 V. Gordon Childe: *Man makes himself*, (London, 1948), p. 29.

6 Bertrand Russell: *The Scientific Outlook*, (London).

7 Crowther: *The Social Relations of Science*, (London, 1967).

7a J. D. Bernal: *Science in History* (London, 1957).

8 Crowther: *op. cit.*, Chapter entitled "Aristotle: A Partial Return to Ionian Thought."

9 Christopher Caudwell: *The Crisis in Physics* (London, 1950) pp. 38-40.

10 Bertrand Russell: *op. cit.*

11 J. D. Bernal: *op. cit.*, p. 885.

12 Christopher Caudwell: *op. cit.*, p. 24.

13 Thomas Kuhn in his lecture entitled "The function of dogma in scientific research", delivered at a symposium held at Oxford in 1961.

14 *Ibid.*

Civilisation—its Origins and Constituents

Sipra Ganguly

Life has been constantly evolving upon earth in varied forms for millions of years, and man appears to be the culminating point of biological evolution. A widely accepted theory induces us to believe that man descended from anthropoid apes, an

event, which, according to the late Professor Gordon Childe,[1] occurred 500,000 years, or perhaps 350,000 years ago, or 300,000 years ago according to Toynbee[2]. Man had to travel a long way through the Paleolithic and Neolithic Ages before he passed from neolithic barbarianism to the state of civilisation. It is surprising that man, surrounded on all sides by beasts, far superior to him in physical strength, did survive to become civilised and to master the earth. Our pre-historic ancestors had to struggle hard for their very existence and every faltering step forward had to be taken through a painstaking process of trial and error, which taxed their ingenuity and presented numerous difficulties to be surmounted. Ultimately, it was resourcefulness that saved man. He made up for what he lacked in physical strength by constructing tools to aid him in whatever job he undertook to do. Compared to the length of time for which man has existed, civilisation is a recent development. Primitive societies had to reach a certain stage of development in every field before they could be called civilised. This naturally raises the question what is civilisation, and what are its conditions and factors.

"Civilisation is social order promoting cultural creation"—this is how Will Durant has defined this rather difficult term. He has further stated that four elements constitute civilisation : economic stability, political organisation, moral traditions and the pursuit of knowledge and the arts.[3] All these factors presuppose a high degree of development, which many races in all parts of the world have been unable to achieve in spite of their continued residence in a particular area and the subsequent contacts they have established with so-called 'civilised' societies. In some cases, this failure may be attributed to geographical and climatic conditions, which affect civilisation. Peoples of the Saharan deserts, for example, had to direct all their energies towards the procurement of food, and hence, could make hardly any movement towards the development of civilisation. We may also note, that the first seats of civilisation were in great river-valleys, which were ideal for agriculture and settled habitation.

With the introduction of cultivation, and the domestication of animals, the first steps towards economic stability were taken, for with these, were established a steady source of food, which is the primary need of man. It is prudent to provide for the future and with agriculture, such prudence could be exercised. Grain stored in granaries enabled man to tide over lean periods, and gave them opportunity to devote his attention to other activities.

Economic development was spurred by the discovery of fire, which man's ingenuity employed in a thousand ways—in the forging of tools, implements and weapons, the making of pottery, etc. "Industry began with fire".[4] The invention of the wheel opened up a whole new field of transport and communication, and ushered in an era of trade. The discovery of copper played its part in building up industry. These were the most important discoveries of mankind. Today, we are so well acquainted with them that we take them for granted. Yet, as Gordon Childe has remarked, no invention of the historic period can equal the importance of these that led men from the barbarism of prehistoric days towards the sophistication of later historic times.

The ingenuity of primitive man equalled, if it did not exceed, that of modern man—the latter's advantage being in his fund of accumulated knowledge, his advanced tools and implements. If modern man prides himself upon his interest in sophisticated scientific research, primitive

man showed greater intrepidity in facing intimidating situations with little to rely on but his brain!

The mechanism of transport, the growth of trade, and the medium of exchange devised by human intelligence fulfilled the basic economic needs of man. Subsequent developments in this field have not contributed further modes of economic progress, but rather elaborated the existing ones. Thus, from mere self-sufficiency, primitive societies graduated to accumulated wealth, and had in this a firm economic basis.

Primitive man was basically anti-social but he co-operated with others because he realised early in his career, that isolation endangered his personal safety, and because more could be achieved by working with others than by working alone. Thus, in spite of his natural inclination, he had to form society. The earliest form of social organisation was the clan, a group of related families occupying a common tract of land. In the days of the 'hunting' man, the clan lived in a simple communistic organisation. This mode of life was encouraged by the risk and danger under which its members lived. But with settled agriculture the institution of private property came into existence. Man laid claim to the piece of land he tilled, and the crops he cultivated. With this individualism, completely in keeping with his natural inclination towards self-advancement, the primitive communism of early societies came to an end.

Yet survival necessitates co-operation, and more advanced political organisation was necessary to maintain this co-operation. Clans united to form a tribe under a common chief. The greed for new hunting grounds and new tillage made war necessary. War instituted the king and the state.

War played an important part in the evolution of the state. "A herd of blonde beasts of prey", says Nietzsche, "a race of conquerors and masters, with all this warlike organisation, and all its organizing power, pounces with its terrible claws upon a population in members possibly tremendously superior, but as yet formless . . . such is the origin of the state."[5] The preparation for war forced a nation to organize itself in order to face its opponents and, having defeated them, to organize the vanquished peoples into a position of inferiority.

Born of force the state endeavoured to maintain peace within itself, by enacting laws and enforcing them, and welding together conflicting groups into a complex structure. Its objects were to protect the individual and his property, and to punish those who transgressed the law. "Human beings find it profitable", says Russell, "to live in communities, but their desires, unlike those of bees in a hive remain largely individual; hence arises the difficulty of social life and the need of the government. . . . Government is necessary; without it a very small percentage of the population of civilised countries could hope to survive, and that, in a state of pitiable destitution."[6]

Let us now analyse the moral elements of civilisation. No society can exist without some moral rules regulating the conduct of human beings towards each other. There is in man an urge towards social co-operation in the form of sympathy. This, however, is overshadowed by his innate selfish propensites. As man became more intelligent the danger arose that he would lose his newly-acquired intellectual powers for achieving his selfish ends. which could be detrimental to society. Man, however, felt that he was confronted by the will of society as expressed in moves, taboos and customs, and to these he had to submit. In course of time, "by long repetition, these customs became second nature to the individual, so that the

violation of them made him feel a certain fear and something like shame, which (according to some), is the origin of conscience".[7] The force of these customs was strengthened by religious dogmas and practices, believed to be the commands of the gods. So the rise of the primitive religions, with their mythologies, kept individualism within limits, and gave opportunities for the social urge in man to grow stronger as he became more enlightened. This according to Bergson is the first of the two sources of religion and morality "a conservative influence which kept duly acquired intelligence from becoming destructive".[8]

Bergson speaks also of a second source of morality. The weight of custom was likely to threaten human progress. This could be detrimental to the interests of society. This was prevented by a higher source of morality and religion, which, according to Bergson is intuition.[9] The great reformers and moral leaders of mankind discovered by intuition the defects in an existing social system and endeavoured to bring about changes and to lift society to a higher moral plane.

From the earliest times, man had been fascinated by the mysteriousness of nature, which he could not control, but which exerted a profound influence on his life. The roots of religion lie, therefore, in his fear of the unknown, and also in his worship of powers which he himself does not possess. Most primitive religions found expression in animism, the belief in spirits behind the forces of Nature, and led to the worship of gods. The gods had to be propitiated in order to prevent calamities. Primitive man revered the gods, and religion could influence him more than science or reason could. Since religion had so much power over him, and could easily command his obedience, political forces utilised such beliefs to enforce their authority. Most states have, therefore, cloaked their authority in a garb of religion, and thus ensured the unquestioning obedience of their subjects.

Finally, we come to the intrinsic elements of civilisation. The human species is distinguished by the possession of an enlarged brain and exceptional intelligence. This has enabled him to create not only material culture, but also to pursue the finer arts that are the embellishment and enrichment of life.

The unique achievement of man is his invention of language, ascribing conventional meanings to the sounds he utters, and identifying them with the objects of the external world.[10] Through language, man was able to transmit his knowledge to his descendants. Language thus added education, which is one of the most important elements of civilisation. Language is essential to clear thinking, the exercise of reason and the play of the mind. With the invention of writing, the transmission of knowledge became easier and surer, and we found a new way to perpetuate our heritage.

The greatest benefit conferred by language and writing was the formation and transmission of ideologies.[11] Ideologies, once adopted, have dictated men's actions in society. But history shows that unless ideologies are in keeping with the economic and material progress of societies, they are likely to be discredited, although in some cases not before they have brought ruin upon society.

Society has derived other benefits from the invention of speech and writing. The external child in man has always liked to listen to stories, and this simple desire has resulted in the cultivation of literature, ever nutured by the gifted story-tellers of every race. Through literature, man has sought to reenact the drama of life, to potray its passions and its strangeness, and to reveal the sublimity which sometimes lurks in its unobtrusive corners. The speculative side of man takes delight in

dwelling on the problems of metaphysics and philosophers have woven fabrics of fantastic ideas to explain what appears to be inexplicable. A more successful application of reason is found in the scientific speculations of man, and in the development of the sciences that enable him to know and control nature. Yet man's creative exuberance is not exhausted by these intellectual pursuits. It finds its highest expression in artistic creation—through painting, sculpture, architecture and music.

The worship of beauty is as old as mankind itself. The norms of beauty differ from age to age, from country to country, even from individual to individual. Yet man has always stopped to admire what pleased him by its form, colour or texture, and in seeking to create beauty, he expresses some of the deeper impulses of civilised man. Art originated simply : the trademark of the potter gave way to embellishment, painted clay provided inspiration for works of greater dimension. The appreciation of beauty has been expressed in a thousand ways : while temples, magnificently sculptured have shown the heights to which man's genius may rise, the tiny tooled beads with which he adorns himself reveal a taste for the delicate and refined. Not only has he created works of beauty that gladden the eye, but he has also woven sound into melodies that delight the ear.

Literature, arts and sciences—these are not the essentials of life. Numerous races all over the world have not even approached the level of culture that produces them —and they are perfectly satisfied with their lives ! But these are richer adornments without which life would be intolerably mundane. Human beings are blessed with imagination and creativity : as soon as some measure of organisation and stability has been achieved, these creative impulses burst forth almost in spite of themselves, to illuminate and colour life with a rich variety and fruitfulness. Man's superior intellectual powers, having solved the problems of survival, turn towards the higher achievements, and in the realisation of these is civilisation sublimated. Hence, what distinguishes the primitive "barbarian" society from the "civilised" is the intellectual achievement of the latter. Economic stability and political order are not in themselves enough to raise primitive society to the status of civilisation. But these are conducive to the arts of peace, and philosophy and literature, science and art, which are the ennobling aspects of civilisation, blossom forth naturally from them.

It must be noted, however, that the economic field was the one which first showed the greatest development in ancient days. Indeed, the origins of political development may be traced in it to some extent. That is why many primitive 'barbarian' societies may show a degree of economic development and some measure of political organisation. Even the rude beginnings of artistic achievement may be found in the painted pottery and the cave paintings of such societies. But as long as the primitive society rests on the basis or rural organisation, it cannot develop civilisation, for civilisation is the product of the city and cannot thrive in the village.[12] The growth of cities is fostered by the development of industry. Hence it presupposes a wealthy economy, an agricultural organisation which is able to support the population of the city, and an intelligent and skilful industrial class. City life is naturally more complex than village life, and to fulfil its various needs, a complicated structure of specialised industrialisation arises. From industrialisation to trade is but a step. The city, therefore, soon becomes the focal point of a healthy and vigorous form of life. The men of skill and superior intelligence, the priests and politicians, the philosophers and artisans collect here, are

thrown together in a complex environment, and react upon each other. The process of association, the linking up of sets of human experience, give rise to a contemplative excitement and that excitement is canalised into concrete forms which may be enjoyed by all. The exchange of ideas, the awareness and appreciation of beauty are the stimuli that spur man on towards higher cultural activity. This is why rural organisation, much simpler, yet at a far lower level of development, can itself never produce civilisation.

Another factor for the development of civilisation is the continued occupation of a single place of habitation, for continuity brings stability. This is stressed in H. G. Wells' definition of civilisation: "Civilisation the settlement of men upon an area continuously cultivated and possessed, who live in buildings continuously inhabited, under a common rule and a common city, or citadel."[13] It is for this reason that nomadic tribes with a precarious economy, are scarcely able to produce civilisation.

Yet, in the development of civilisation, the racial element is of small importance. As Toynbee has pointed out, in his analysis of the element of "challenge and response", civilisations have constantly been challenged by other societies and races, and have reacted upon each other variously.[14] The Harappan civilisation of the Indus Valley, for example, was subjected to the challenge of the invading hordes of Aryans. In this case, it could not stand the shock of the invasion yet although it perished materially, it continued to exercise its influence upon the Aryan Society for generations. Sometimes, a civilisation cannot withstand the challenge of the invader, and disappears completely; in other cases, it is the invader that adopts the culture of the vanquished. But it is through this element of "challenge and response" that civilisations have been destroyed, transformed or renewed. Hence Toynbee describes it as the most important element of civilisation.

History illustrates how difficult it was for man to evolve civilisation in all its aspects—witness the many centuries of struggle that preceded the appearance of the Egyptian, Sumerian and Harappan civilisations. History also points out how fragile civilisation is how, in spite of the many elements that enter into its evolution, a single blow is sufficient to destroy it. Nature's vagaries or the whims of aggressive forces, the exhaustion of natural resources, the moral decay of a people, the lack of leadership, or even a defeatist philosophy or an unsuitable ideology is enough to bring down the structure created by all the skill and ingenuity that man can command. The forces of destruction have no regard for the hard-won achievements of man, and may irrevocably ruin the work of centuries in a matter of years. But man's spirit is indomitable and civilisation is based on his dynamism. In spite of adverse circumstances which may destroy a civilisation, man will build again, through higher planes because he will not accept defeat because his nature precludes stagnation.

NOTES

1 V. Gordon Childe, *What Happened in History*, Penguin 1942, p. 21.
2 Arnold Toynbee, *A Study of History*, Abridgement of Vols. I-VI by D. C. Somervell, Vol. I, Dell 1969, p. 53.
3 Will Durant, *Our Oriental Heritage*, Vol. I of the series, the Story of Civilisation. Simon and Schuster, 1935, p. 1.
4 Durant, *op. cit.*, p. 11.
5 Nietzsche, *Geneology of Morals*, p. 103. Cited in Durant, *op. cit.*
6 B. Russell, *Power*, George, Allen and Unwin 1938, p. 138.
7 Durant, *op. cit.*, p. 36.
8 W. Wright, *A History of Modern Philosophy*, Macmillan, 1941, p. 575.
9 W. Wright, *op. cit.*, *p.* 576.
10 Childe, *op. cit.*, p. 17.
11 Childe, *op. cit.*, p. 22.
12 Durant, *op. cit.*, p. 2.
13 H. G. Wells, The *Outline of History*, Cassel and Co., 1920.
14 Toynbee, *op. cit.*, pp. 81-102.

The Report of the Publication Secretary

Swapan Chakravorty

The *Foreword* to our last issue was quite certain about the magazine having a regular publication. Matters took an ironic turn this year, with a phenomenal increase in the cost of paper and printing accompanying a fifty percent cut in the budget. The discretion of the Principal might have pulled us through this time, but that is hardly an enduring solution. Some means of increasing the funds must be found out if the *Presidency College Magazine* is to survive.

Obviously, our plans had to be less ambitious this year. But we endeavoured to remain fairly uncompromising regarding the quality of the contributions. The stale complaint about being high-browed has been answered in the *Editorial*. Somehow, Presidency College manages to get the magazine it deserves.

Little could have been achieved without the precious guidance of Sri Arun Kumar Das Gupta, our professor-in-charge. Sri Baidyanath Mukhopadhyaya and Sri Sukanto Chaudhuri also provided valuable help and suggestions. Genuine co-operation from students was rare.

* * * *

This year, Edward Farley Oaten, that one-time professor of History whose name has become inalienably linked with the career of Netaji, died in England. We also mourn the death of Sachchidananda Bhattacharya, who taught History in the College, and Prof. Niranjan Dey of the Geography department.

News reached us this year that Prof. T. S. Sterling, who spent a number of years here as teacher of English, has left Rs. 1,57,551 in his will for the needy scholars of Presidency College. This inspiring gesture speaks for itself.

This year we proudly celebrate the 50th. anniversary of the publication of Prof. Satyen Bose's theory (the celebrated Bose Statistics) by Albert Einstein. We also welcome the proposal for founding an Institute for Theoretical Physics in Calcutta to be named after him.

We are also proud to note that a former editor and secretary of this magazine, Ajit Nath Roy, has been appointed Chief Justice of India.

The distinguished economist, Prof. Amartya Sen visited the college on December 8, 1973. He delivered a lecture on "The Monotonicity of the Present Value Function".

Prof. Amiya Bagchi, who was Head of the Department of Economics, has left for Cambridge to work on some aspects of economic development.

Prof. Bhupatimohan Sen, one-time principal of this college, has been awarded the Padmabhusan. The aged and universally respected professor has little to gain by this late recognition, but we feel that the award itself has been thus honoured.

The Physics Association:

The students of the Physics department have formed *The Physics Association*. Its aim, the organizers wishes me to state, is to promote free thinking and scientific enquiry. It intends to hold seminars and film-shows, and to publish a wall-magazine regularly. Representatives of the Association held a discussion with Prof. P. T. Landsberg, the distinguished scientist, during his recent stay at Calcutta. The Association also arranged a lecture to celebrate the 50th anniversary of the discovery of Bose Statistics, Prof. Shyamal Sengupta lectured in Bengali.

* * * *

The Students' Union:

Lack of space prevents us from publishing a detailed account of the Union's activities. What follows is a brief resume and omissions are inevitable. After our last issue went to press, a seminar on Higher Education was held at the college auditorium. Prof. D. P. Chattopadhyaya, Union Minister, Prof. Amiya Bagchi, Prof. N. C. Basu Ray Chaudhuri and Prof. Barun De were among the speakers.

This year, the Debating Society organized an intra-college debate competition. Palash Baran Pal Majumdar (2nd Year,

Physics) was declared the best speaker. He opposed the motion *Democracy is the Ideal Form of Society*. Manojit Dasgupta (Economics) was the best speaker at this year's Freshers' Debate. The motion was *The Society is for the Individual rather than the Individual for the Society*. Sudhangshu Dasgupta, Satyesh Chakraborty, Indrajit Gupta and Kalyan Chatterjee were the invited speakers at the annual Past vs. Present Exhibition Debate. The subject this time was *The Proletariat alone can see Society in its Reality*. The annual inter-collegiate debate competition had to be postponed since, for some reason, the microphones failed to work. The organizers, however, must accept the major share of the blame. Our debaters won the competitions organized by the Calcutta University Institute and the Youth Combination. They also did well at the debates held by Lady Brabourne College, Jadavpur University, Loreto House, and the All India Radio, Yuvabani. Our team also won the second prize at the Quiz Competition held at the American University Center. The Debating Society may perform better if the college purchases the necessary amplifying equipment. A similar suggestion made in our 1956-57 issue had been futile.

The inertia of the Drama section is difficult to explain. Only one Bengali one-act play was presented at the Freshers' Welcome. It was a singular flop since all the actors were uniformly inaudible. The college authorities must do something to improve the acoustic arrangement of the auditorium.

The Rabindra Parishad presented a programme entitled 'Sharodtsab' the purpose of which remained obscure till the end. Earlier, its celebration of the birth anniversary of Tagore had been fairly successful. Ashoketaru Bandopadhaya gave a recital of songs of Tagore.

The Social Service unit, as usual, did little worth its name. Its funds were made available to a needy student. The Union presented a Variety Entertainment in aid of the distressed students of the college. It was preceded by a collection-drive which, unfortunately, evoked a disheartening response. Students also collected money for flood-relief.

Increased student participation was a novel feature of the College Social and the Freshers' Welcome this year. The effect, however was not uniformly inspiring. The programme was inaugurated by Sri Saugoto Ray, a former student of the college. The Union presented an enlightening Seminar on the Bengali Theatre. Sri Shombhu Mitra and Sri Rudraprasad Sengupta were the speakers. Dr. Haraprasad Mitra presided. A film on the anti-apartheid struggle in South Africa and Mozambique was shown at the Physics Lecture Gallery. A show of some Czech films was also presented by the Union.

Amit Banerji (outgoing 3rd yr., History) won the intra-college table-tennis tournament held at the commonroom. The problems of the Girls' Common Room are in desperate need of attention.

While admitting its failures, the Union intends to point out that it could have done better with better funds and co-operation. In view of the paucity of both, the little it has done seems admirable.

An Appeal :

Next year, the 60th issue of the *Presidency College Magazine* is due to be published. The fund at the disposal of the college, we are aware, is hopelessly inadequate to meet the needs of our Diamond Jubilee issue. We appeal to all quarters—to the Education Department of West Bengal in particular—to help us in finding a way out of the crisis. We insist that the survival of the *Presidency College Magazine* should be the collective concern of all who have love or regard for the college.

Notes on Yours Affectionately, *K. Zachariah*

Letter 1 is dated Kurial, Tiruvalla, Trav., 21.5. [1923].

Letter 2, para 2 : 'The Mahomedan girl', Syeda Khower Sultan Muwayyidzada of Diocesan College, stood second in Class I in the B.A. History Honours examination of the Calcutta University in 1923. Nareschandra Ray, 'the Scottish Churches man', came third.

Letter 4, para 1 : 'Our lost first place' was recovered by Mr. Sushilchandra Chatterjee, the recepient of these letters. He

was also Secretary, Presidency College Historical Society.

Letter 4, para 2 : 'Dr. Ghoshal', that is, Dr. Upendranath Ghoshal. He was a member of the History Department, Presidency College, 1909-14, 1919-40. He had already published *The History of Hindu Political Theories* (Calcutta, 1922).

Letter 7, para 1 : Bibhuti Bhusan Banerji : Mr. Chatterjee does not remember him.

Letter 8 was written on board *Carinthia*, a Lloyd Triestino passenger liner.

Letter 8, para 4, and letter 9, para 1 : The first impressions of Greece were nostalgically recalled in 'A Fortnight in Greece', *Presidency College Magazine*, Dec. 1927 (repr. in the Golden Jubilee number of the Magazine, 1964).

Letter 9, para 2 : Zachariah had been at Merton College, Oxford (1912-15) on a Government of India scholarship. He became a legend by taking a First in History with eleven alphas and two alpha-betas out of a total of thirteen papers.

Letter 9, para 2 : 'Prof. H. K. Banerji', that is, Prof. Hiran Kumar Banerjee of the Department of English, Presidency College, 1924-26, 1928-41. His publications include *Henry Fielding* (Oxford, 1929).

Letter 9, para 4 : Mr. Chatterjee did well enough : he came first in the M.A. examination in History in 1927.

Letter 9, P.S. : Mr. Haripada Maitra, a classmate of Mr. Chatterjee's, never studied agriculture ; he retired as Superintendent, Land Acquisition Tribunal, West Bengal.

Letter 9, P.S. : 'Prof. Coyajee' : the reference is to Prof. (later, Sir) Jahangir C. Coyajee who taught Economics at Presidency College, 1911-30, and was Principal, 1930-31.

Letter 10, para 1 : 'It is brave, hopeful men like you that keep the world going around, not cowards like me who shrink from doubtful adventures !'— Kuruvilla finally took the plunge in 1929 ; the bride was Miss Shanti Dey, who had been his student in the post-graduate class of the Calcutta University. She was placed fourth in Class I in the M.A. examination in 1927.

Letter 11 : Professor of History at Presidency College since 1916, Zachariah went to Hooghly Mohsin College as Principal in 1930.

Letter 11, para 2 : 'Baby', Zachariah's first son George, now works as an architect for a Swedish ship-building firm at Gothenburg.

Letter 12, para 2 : Zachariah's *History of Hooghly College, 1836-1936* (B.G. Press, Alipore, 1936) marked the College's centenary and is still a model of modern Indian historical writing.

The interested reader will find more information about Kuruvilla Zachariah (1890-1955) in *K. Zachariah, A Short Memoir* (Madras, 1961), published by members of his family and consisting mainly of contributions by his many friends and admirers in India and abroad, and in the appreciations written by four of his students, Narendra Krishna Sinha, Ajit Nath Ray, Susobhan Chandra Sarkar, and (anonymously) Tarak Nath Sen, and published in the *Presidency College Magazine*, respectively in Jan. 1948, June 1955 (College Centenary Commemoration number), 1964 (Golden Jubilee number) and in the *Presidency College, Calcutta, Centenary Volume*, 1955.

Nilmoni Mukherjee
Hiren Chakrabarti

For unavoidable reasons these *Notes* could not come immediately below the letters. We regret any inconvenience caused to readers. —Editor.

The magazine had practically neared completion when on 4th February came the news that Professor Satyendranath Bose had passed into the unknown beyond. We decided to hold up the magazine for some time to pay our tribute to Prof. Bose. Through the following article, written by a young physicist, we pay our humble homage to the man who was a legend in his life-time.—Editor

Prof. S. N. Bose
a personal tribute

Jishnu Dey

I feel small to write about a great man of the stature of Professor Bose. Great people have written about him, from Einstein to Sudershan, from Tagore to my father. I have not known him for half as long as my father ; and even though I may understand Bose's scientific papers better than my father that is poor consolation. For as all know Prof. Bose was "a tall scientist ; the humanist in him stands even taller."

* * *

In the January 1974 issue of *Science Today* there is a very stimulating section on Prof. Bose to which I shall often refer. In this Girijapati Bhattacharya had written the sentence ending the previous paragraph in the present tense. It is now in the past, the past in which we had original thinking, original creative work : Sudhindra Nath Datta, Jamini Roy and Satyendranath Bose. Literature, Art and Science to them was something linked with social phenomenon. To quote Prof. Bose : "When we were students then nationalism was flooding the country. We thought, let us see if we can do any thing for the country by reading Science. So we started." This, as I had remarked in a Bengali note a decade back, partly explains the crowding of Prof. Bose, M. N. Saha, N. R. Sen, G. C. Ghose, G. K. Mukherjee, S. R. Bose and so many others in the same batch.

But neither Jamini Roy nor Satyen Bose were amateurish in their love for their country as some of our nationalist politicians were. So naturally they were critical. Critical of our independence, our allegiance to English culture, our imitation of western society. Even during his birthday broadcast Prof. Bose was criticising All India Radio. To me, this critical spirit and this idea of social linkage characterizes the spirit of Prof. Satyendranath.

Yes, Sudhin Datta and Dhurjatiprosad, Jamini Roy and Satyendranath Bose—my father had greatly cared for these people. But I had not come to know Prof. Bose through my father, in a way it came more naturally. He was always for the downtrodden. Let me relate the circumstances.

My mother had worked in a South Calcutta school for almost two decades. Her day was spent in the school. Late evening and even during sleep she was mentally working for the school. Then she was forced to resign. She was grief-stricken. I remember, it was the first summer vacation of my life when everyday my mother was cooking our food. It was so unusual ! But this is not an unusual fate for many devoted School teachers.

Then one day a reply-paid telegram came and I heard my father tell my mother that when such a great man as Prof. Bose asks one to do something one should not back out.

* * *

So my mother abandoned her diffidence and agreed to leave her home and went to Santiniketan to teach. When I went to stay with her during my holidays, I met Professor Bose. I was reading science in school and was an enthusiastic listener of Western and Eastern classical music. It was the best introduction for a young boy to Prof. Bose.

In fact from my interest in music, I used to fiddle around with our gramophone. When Prof. Bose came to know this he asked me to read Physics. First in Presidency College and then in Jadavpur under Prof. Shyamadas Chatterjee, well known for his experimental skill. Well, when a great man like Prof. Bose asks, one has to . . . . .

* * *

He was thoughtful and kind to all. Unbelievable as it may sound, the great scientist used to spend hours with a school boy, discussing Physics of music. I had two preoccupations in Santiniketan. In the morning, I would go to Rabindra Sadan, where on Tagore's piano, Miss Schönberger, organist from Köln Cathedral, would play Bach and Beethoven, "to keep her practice." And in the hot afternoon, wet from a bath, the white hair dripping, Prof. Bose would play on the Esraj and talk, about Physics, music, friends, stories, experiments. May be to keep his practice . . . .

Because Santiniketan was also a most amateurish Institution run on strange methods ; the Utopian dream of another great thinker, it had lost its touch with reality, as Tagore passed away.

Sudhin Ghose, nephew of Rashbehari Ghose who was smuggled out of the country in his youth, after some terrorist incident, was a great friend of Prof. Bose. He was well known as a teacher and a novelist in Oxford—but was of course little known here. He also could not refuse Prof. Bose and came to Santiniketan.

* * *

As Head of the English Department Sudhin Ghose used to work hard and my mother and some others in the English Department used to admire his work. This was found to be intolerable. In the first score outsiders to Santiniketan should not work there. And if they work hard, it is worse, for it hurts insiders. So they beat up Sudhin Ghose, he ultimately lost an eye, left for England and died there, I think in 1962.

Later on, of course, Tagore's "nature" has been "protected" from extremists by grotesque fences and when the doors are open the garden is not and vice versa. The noted litterateur Annada Shanker Roy finally left the place after a few decades of retired life there as he found the place unlivable.

* * *

But why blame Visva-Bharathi alone ? Only the other day we were wondering how little we know about one who was perhaps the most significant scientific figure of our country. In *Science Today* E. C. G. Sudershan speaks about the Master, meaning Einstein, failing the student, Bose. But is it Einstein alone ? Haven't we all failed him more or less ? Those who are callous to his work often vaguely say that Bose's greatness is in pleasing Einstein. But actually, we have been engaged in investigating his contribution, in the Physics Department of Presidency College recently —thanks to Prof. A. K. Raychaudhury and Prof. S. Sengupta. And it seems to us that Bose's contribution in 1924 is a bold and intuitive jump into quantum physics which was not, in a sense, very much farther clarified by Einstein. The clarification came in 1926-27 principally in Dirac's paper. Einstein's application to gases was prompted by Louis de Broglie's idea of matter waves—i.e. similarity of photons and material wave-particles. Louis, who was Bose's close friend in Paris in 1924. In that sense certainly Einstein could have, as pointed out by Sudershan, asked Bose to apply his own law to gas particles.

It is also true that Bose did not again write on radiation after Einstein's dissent on his second paper although there is mention of a third paper apparently approved by Langerin in his letter to Einstein published on this matter. The induced emission may very well be a experimentally

verified statistically observed phenomenon. But from the point of view of the elementary particle physicist, the decay of a resonant excitation, for example, is purely a matter of internal dynamics. This then must be treated on a different footing from the gross collective absorption and emission induced by the external photon density. It is probably in this general sense that Prof. Bose had expressed his desire that the critical physical community of today should revisit his objections to Einstein's induced emission.

I remember in Santiniketan he was explaining something to me. There was perhaps a careless mistake in some step and I was seeking to help him to put it right. My father, who was in the room was shocked at the idea of a schoolboy daring to correct Prof. Bose. But, Prof. Bose emphasized, this is quite in order. It was this spirit, this critical spirit that is his great contribution to us. To quote again from *Science Today* : " 'Never accept an idea as long as you yourself are not satisfied with its consistency just because it has been said by someone in authority." (N. D. Sengupta—p. 42)

* * *

Last when I saw him conscious a few months back, I was telling him I am finding interest in Quantum Theory of Measurement and some other such epistemological problems of Quantum Mechanics. I was asking him about his friend Louis de Broglie who is now very active in this field. Some of Louis' concepts are fascinating—for example his demonstration that one can assign entropy to waves and states and then monochromatic waves and stationary states represent maximum entropy. Hence their abundance in present day Quantum Mechanics.

We went into a very lively discussion with him in a reminiscent mood but unfortunately some unwanted visitors butted in. "Continue reading along this line" was his last advice when I left. Of course, when Prof. Bose asks one to do something one should not back out.

* * *

Europe and America are now alive to these basic problems of Quantum Mechanics. And it seems to me that the idea of indistinguishability, which was vaguely there in Prof. Bose's 1924 paper, making him consider photons not as discrete particles but rather as a continuum to be distributed in discrete cells—this is the most universally accepted idea in Quantum Mechanics. Others like duality and complementarity stand to critical revision. Steps in these direction are desrcibed for example in the 1972 Italian 'Enrico Fermi' school, notably in Wigner's opening summary. A smashing blow to duality has been dealt by Afred Landé in his *New Foundations of Quantum Mechanics.* Another most interesting book is the 1971 volume for the 80th birthday of Prof. Landé. In that among a host of critical papers is one by Bondi from which I quote my finalé :

"The notion of identity of atoms is so appealing because it seems to simplify the picture of the world . . . we accept with the notion of their identity a limitation of our potential knowledge and accept the notion of indistinguishable objects. This fundamental idea of quantum statistics is thus already inherent in Dalton's work. In a course on quantum theory *Bose Statistics could thus be derived at a very early stage* . . . . We thus arrive at a point so strikingly and clearly put by Popper when he said that quantum theory gave statistical answers because it asked statistical questions. The prediction of non-identical behaviour of identical individuals can be carried out only in a statistical manner."

The guideline of this mode of thought for the future then comes from Prof. Bose.

Our Contributors

Amal Bhattacharji : ex-student ; former Professor of English.

Atindra Mohan Goon : ex-student ; Head of the Department of Statistics.

Jishnu Dey : ex-student ; teaches Physics in the College.

Shirshendu Chakrabarti : former student of English ; presently studying at the Delhi University.

Sipra Ganguly : student of second-year History ; slander-mongers observe that she somehow misses, to borrow her own phrase, the culminating point in the process of biological evolution. We, however, are less suspicious about her civilization and constituents.

Sumit Ranjan Das : student of second-year Physics ; there is hardly a match for this midget-sized wonder, if only because of the highly resonant cavity that is his head.

Supriya Dasgupta : former student of English ; now studying at Oxford.

Swapan Chakravorty : student of second-year, English ; capricious intellectualism could be his creed, not that it lends his intellect any credence ; takes active but futile interest in politics ; quizzical, musical and debatable.

Past Editors and Secretaries

Year	Editors	Secretaries
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee Brajakanta Guha	Bimal Kumar Bhattacharjyya Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sirkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti

Year	Editors	Secretaries
1934-35	Ardhendu Baksi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Datta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	No Publication	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindramohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbhadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendu Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya	Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66	No Publication	
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68	No Publication	
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-70	No Publication	
1970-72	No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty

Year	Editors	Secretaries
1934-35	Ardhendu Baksi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Datta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	No Publication	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindramohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbhadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendu Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya	Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66	No Publication	
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68	No Publication	
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-70	No Publication	
1970-72	No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty